ইউনিট
৫

মৎস্য ভিত্তিক সমন্বিত খামার

ভূমিকা

বাংলাদেশ একটি ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। এদেশের ক্রমবর্ধিষ্ণু জনগোষ্ঠীর তুলনায় জমির পরিমাণ এবং মৎস্য উৎপাদন অপ্রতুল। দেশের ক্রমবর্ধমান বিশাল জনসংখ্যার পুষ্টি চাহিদা পূরণ, জমির স্বল্পতা এবং মৎস্য জাতীয় খাদ্যের অপ্রতুলতা দূর করার জন্য একই জায়গায় মাছ ও চিংড়ির মৎস্য ভিত্তিক সমন্বিত খামার এর গুরুত্ব অপরিসীম। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে মাছে ভাতে বাঙ্গালী হিসেবে পরিচিত এদেশের মানুষের খাদ্য তালিকায় মাছ প্রতিনিয়ত থাকছে না। জনসংখ্যার তুলনায় মানুষের দৈনিক মাথা পিছু মাছ গ্রহণের পরিমাণ কমে যাচ্ছে। সমন্বিত মৎস্য খামারে একাধিক উৎপাদন প্রক্রিয়া যুগপৎভাবে এগিয়ে চলে। আর এ প্রক্রিয়ায় মাছ চাষ কার্যক্রম অন্যান্য উৎপাদন প্রক্রিয়ার উপজাত বা বর্জ্য দ্রব্য দ্বারা প্রভাবিত হয়। সমন্বিত মৎস্য খামারের পুকুর ব্যবস্থাপনা হলো পুকুরে হাঁস-মুরগি, গবাদিপশু বা অন্যান্য শস্য বর্জ্যের পরিমিত ও যথাযথ ব্যবহার, পুকুর প্রস্তুতি, পুকুরের পানিতে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্যের পরীক্ষা, পোনা মজুদ, মাছের স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি কার্যক্রম। এদেশে ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর প্রোটিন চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, দেশের উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে সম্প্রসারিত হচ্ছে মাছ চাষের বিভিন্ন আধুনিক প্রযুক্তি ও কলাকৌশল। সমন্বিত মাছ ও চিংড়ির চাষ, সমন্বিত মাছ চাষের খাদ্য ব্যবস্থাপনা, মৎস্য খামারে অল্প শ্রমে স্বল্প ব্যয়ে একই জায়গায় অধিক উৎপাদন সম্ভব হয়। সমন্বিত মৎস্য খামারে প্রজাতি নির্বাচন, মাছ ছাড়ার হার নির্ধারণ, পোনা মজুদকরণ ও চাষ ব্যবস্থাপনার উপর সার্বিক উৎপাদন নির্ভরশীল। উৎপাদিত মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মাছের খাদ্য তৈরিকরণ এবং প্রয়োগ পদ্ধতিও উৎপাদনকে প্রভাবিত করে। উপরোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় এনে এ ইউনিটের বিভিন্ন পাঠে মৎস্য ভিত্তিক সমন্বিত খামারের সম্ভাবনা ও করণীয়, সমন্বিত মৎস্য খামারের পুকুর ব্যবস্থাপনা, সমন্বিত মাছ চাষে খাদ্য ব্যবস্থাপনা, সমন্বিত মাছ ও চিংড়ি চাষ, মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ এবং মাছের খাদ্য তৈরিকরণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিকসহ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ০২ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ৫.১ : মৎস্য ভিত্তিক সমন্বিত খামার (সম্ভাবনা ও করণীয়)
পাঠ - ৫.২ : সমন্বিত মৎস্য খামারের পুকুর ব্যবস্থাপনা
পাঠ - ৫.৩ : সমন্বিত মাছ চাষে খাদ্য ব্যবস্থাপনা
পাঠ - ৫.৪ : সমন্বিত মাছ ও চিংড়ি চাষ
পাঠ - ৫.৫ : মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ
পাঠ - ৫.৬ : ব্যবহারিক: মাছের খাদ্য তৈরিকরণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি

পাঠ-৫.১ মৎস্য ভিত্তিক সমন্বিত খামার (সম্ভাবনা ও করণীয়)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মৎস্য ভিত্তিক সমন্বিত খামার বলতে কী বোঝায় তা বলতে ও লিখতে পারবেন।
- মৎস্য ভিত্তিক সমন্বিত খামারের সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- মৎস্য ভিত্তিক সমন্বিত খামার স্থাপনের ক্ষেত্রে করণীয় বিষয় সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

মৎস্য ভিত্তিক সমন্বিত খামার

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৭০% এর বেশি মানুষ গ্রামে বসবাস করে এবং মোট আবাদ জমির প্রায় ৫% বসত বাড়ির আশে পাশে বিদ্যমান। গ্রামে অধিকাংশ কৃষকের বাড়িতে ছোট বড় পুকুর থাকে। যার অধিকাংশই অব্যবহৃত থাকে। আর এসকল অব্যবহৃত পুকুর বা জলাশয় নিয়ে গড়ে উঠতে পারে মৎস্য খামার। সাধারণভাবে মৎস্য খামার হলো মাছ চাষের ক্ষেত্র। আর মৎস্য ভিত্তিক সমন্বিত খামার একটি বহুমূখী উৎপাদন ক্ষেত্র যেখানে মৎস্য চাষের সাথে সাথে মাছের খাবার তৈরির ব্যবস্থা, মৎস্য প্রজনন ব্যবস্থা, সমন্বিত মাছ ও চিংড়ি চাষ, মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণের ও সংরক্ষণের ব্যবস্থাসহ মৎস্য বাজারজাতকরণের প্রাথমিক কার্যাবলী সম্পাদন করার সুবিধাদি বিদ্যমান থাকে। এ ধরনের মৎস্য ভিত্তিক সমন্বিত খামার আমাদের দেশে করা সম্ভব। কেননা আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ চাষ ও অন্যান্য খামার ব্যবস্থাপনার সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে অধিক পরিমাণ মাছ উৎপাদন করে দেশের মানুষের আমিষের চাহিদা পূরণ, বাড়তি আয়, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বহুমূখী কর্মদক্ষতার উন্নয়ন, মৎস্য শিল্পের প্রসার ও রপ্তানি আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে এদেশের দারিদ্র বিমোচন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। সমন্বিত মৎস্য চাষের জন্য বিভিন্ন মাছের ও চিংড়ির পোনা এদেশের প্রাকৃতিক উৎস থেকে সহজে সংগ্রহ করা সম্ভব।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা মৎস্য ভিত্তিক সমন্বিত খামার স্থাপনের সম্ভাবনা ও করণীয় বিষয় সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন তৈরি করে জমা দিবেন।

সারাংশ

বাংলাদেশের গ্রামে অধিকাংশ কৃষকের বাড়িতে ছোট বড় পুকুর থাকে। কিন্তু বেশির ভাগ পুকুরই সঠিকভাবে মাছ চাষে ব্যবহৃত হয় না। এসকল অব্যবহৃত বা আংশিক ব্যবহৃত পুকুর গুলোকে কাজে লাগিয়ে সমন্বিত মৎস্য খামার করা সম্ভব। সমন্বিত মৎস্য খামারে বহুমূখী উৎপাদন কার্যক্রম বিদ্যমান থাকে। তাই এর মাধ্যমে মানুষের আমিষের চাহিদা পূরণ, বাড়তি আয়, দারিদ্র বিমোচন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা সম্ভব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.১

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। বাংলাদেশে মোট আবাদি জমির শতকরা কত ভাগ বসতবাড়ির আশে পাশে বিদ্যমান?

(ক) ৩ ভাগ (খ) ৫ ভাগ
(গ) ৭ ভাগ (ঘ) ১০ ভাগ

২। মৎস্য ভিত্তিক সমন্বিত খামারের ক্ষেত্রে নিচের কোনটি মূখ্য ফসল?

(ক) শস্য (খ) চিংড়ি
(গ) মাছ (ঘ) মুরগি

পাঠ-৫.২ সমন্বিত মৎস্য খামারের পুকুর ব্যবস্থাপনা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সমন্বিত মৎস্য খামারের পুকুর ব্যবস্থাপনা বলতে কী বোঝায় তা বলতে পারবেন।
- সমন্বিত মৎস্য খামার ব্যবস্থাপনায় পুকুরের আকার ও আয়তন কেমন হওয়া উচিত তা বলতে ও লিখতে পারবেন।
- পুকুর সংস্কারের ধাপগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।
- সমন্বিত মৎস্য খামারের আতুর পুকুর ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সমন্বিত মৎস্য খামারের লালন পুকুর ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- সমন্বিত মৎস্য খামারের মজুদ পুকুর ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বলতে ও লিখতে পারবেন।
- সমন্বিত মৎস্য খামারের বিভিন্ন পুকুরে মাছের বৃদ্ধি পরীক্ষাকরণ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

সমন্বিত মৎস্য খামারে একই সাথে একাধিক উৎপাদন প্রক্রিয়া এগিয়ে চলে। এ প্রক্রিয়ায় মাছ চাষ কার্যক্রমের উপকরণের যোগান আসে অন্যান্য উৎপাদন প্রক্রিয়ার উপজাত বা বর্জ্য হতে। এসব দ্রব্যের পরিকল্পনাভিত্তিক সুষ্ঠু ব্যবহার ও প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক। সমন্বিত মৎস্য খামারের পুকুর ব্যবস্থাপনা বলতে পুকুরে হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা বা গবাদি পশুর মল বা বর্জ্যের পরিমিত এবং যথাযথ ব্যবহার, পুকুর প্রস্তুতি, পুকুরের পানিতে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্যের উপস্থিতির পরীক্ষা, পোনা মজুদ, মাছের স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি কার্যক্রমকে বোঝায়। সমন্বিত মৎস্য খামারে বহুমূখী উৎপাদন কার্যক্রম পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও নির্ভরশীলতার মধ্য দিয়ে আবর্তিত হয়। তাই সমন্বিত মৎস্য খামার স্থাপনে পুকুর খননের পরিকল্পনা ও নকশা তৈরির সময় অন্যান্য উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যৌক্তিক ব্যবস্থা রাখতে হয়। অর্থাৎ পুকুরের পাড়ে বা পানির উপরে মুরগি পালনের জন্য ঘর নির্মাণ, হাসের বিচরণ ক্ষেত্র, গবাদিপশুর ঘর, গোবর-চনা প্রভৃতি পুকুরে নির্গমনের জন্য ব্যবস্থা রাখতে হয় এবং খামারের স্থান ও আয়তন এর পরিকল্পনা করতে হয়।

বিজ্ঞান ভিত্তিক আধুনিক মাছ চাষের জন্য তিন ধরনের পুকুরের প্রয়োজন হয়। যেমন- আতুর পুকুর, লালন পুকুর ও মজুদ পুকুর। সমন্বিত মৎস্য খামারের মোট আয়তনের ৬০-৬৫ ভাগ জায়গায় পুকুর কাটা যেতে পারে। পুকুরের জন্য নির্ধারিত জায়গার ২০ ভাগ আতুর পুকুর ও লালন পুকুর আর ৮০ ভাগ জায়গায় মজুদ পুকুর খনন করা যেতে পারে। মজুত পুকুরের আয়তন ৩০ শতক হতে ১ একর পর্যন্ত করা সম্ভব। আতুর পুকুর ও লালন পুকুরের পানির গভীরতা ১.০-১.৫ মিটার হলে সুবিধাজনক হয়। পুকুর আয়তাকার এবং উত্তর দক্ষিণে লম্বা হলে ভালো হয়। পুকুরের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ২:১ বা ৩:২ হতে হবে। এ ধরনের পুকুরে পর্যাপ্ত সূর্যালোক পড়ে এবং পুকুরের পানিতে বাতাস বেশি মিশ্রিত হওয়ার সুযোগ পায়। ফলশ্রুতিতে অধিক পরিমাণে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপন্ন হয়। পুকুরের পাড়ের ঢালের অনুপাত মাটির প্রকৃতির ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন রকমের হয়। বেলে দোঁ-আশ মাটিতে পুকুরের ভিতরের দিকের ঢাল ২.৫:১ এবং পাড়ের বাইরের দিকের ঢাল ২:১ রাখা যেতে পারে। দোঁ-আশ মাটির পুকুরের পাড়ের ভিতরের ঢাল ২:১ এবং কাদা মাটির ক্ষেত্রে ১:১ রাখা উচিত। এ ক্ষেত্রে বাইরের দিকের ঢাল যথাক্রমে ১.৫:১ এবং ২:১ রাখা উচিত। এতে পাড় স্থায়ী হয় এবং পুকুর ব্যবস্থাপনায় সুবিধা হয়। পুকুরের তলা সমান এবং একদিকে ঢালু হলে মাছ আহরণ ব্যয় হ্রাস পায় ও ব্যবস্থাপনায় সুবিধা হয়। পুকুর বেশি দিনের পুরানো হলে মেরামত বা সংস্কার করতে হয়। পুকুর সংস্কারের প্রথম ধাপ হলো পাড় মেরামত ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নয়ন। পুকুর পাড়ে বড় গাছ পালা থাকলে সেগুলোর ডালপালা কেটে দিয়ে পুকুরে দিনে ৬-৮ ঘন্টা সূর্যালোক পড়ার ব্যবস্থা করতে হবে। পুকুর পাড়ে ঝোপ-ঝাড় থাকলে সেগুলো কেটে পরিষ্কার করতে হবে। পুকুরের পাড় এমনভাবে মেরামত করতে হবে যেন বন্যায় ডুবে না যায়। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পুরানো পুকুরের তলার কাদা পুকুর শুকিয়ে সরিয়ে ফেলতে হবে। সমন্বিত মৎস্য খামারে পুকুরের পানি যেন দূষিত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

সমন্বিত মৎস্য খামারে আতুর পুকুরের আয়তন ১০-২৫ শতক এবং পানির গভীরতা ১.০-১.৫ মিটার হলে ব্যবস্থাপনার জন্য সুবিধাজনক হয়। আতুর পুকুর বন্যামুক্ত হতে হবে এবং পাড়ে বড় কোনো গাছ পালা থাকবে না। পুকুরে পানি ভরাট করা এবং নির্গমনের ব্যবস্থা থাকতে হবে। রেণু পোনার বেঁচে থাকার হার এবং বৃদ্ধি আতুর পুকুরের ব্যবস্থাপনার ওপর নির্ভরশীল।

সমন্বিত মৎস্য খামারের আতুর পুকুর ব্যবস্থাপনার জন্য করণীয় ধাপগুলো হলো - পুকুর প্রস্তুতি, রেণু ছাড়া, সার প্রয়োগ, খাদ্য সরবরাহ, পোনা বাঁচার হার ও বৃদ্ধি পরীক্ষা এবং পোনা আহরণ। আতুর পুকুর প্রস্তুতির ক্ষেত্রে পুকুরের তলায় বেশি কাদা থাকলে পুকুর শুকিয়ে তা ফেলে দিতে হবে। আর পুকুর শুকানো সম্ভব না হলে পুকুরের অবাঞ্চিত ও রাক্ষুসে মাছ সম্পূর্ণরূপে সরিয়ে ফেলতে হবে। এক্ষেত্রে রাসায়নিক দ্রব্য এবং চুন সঠিক মাত্রায় সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে হবে। রেণু পোনার প্রাকৃতিক খাবার তৈরি হওয়ার জন্য পুকুরে সঠিক মাত্রায় সার প্রয়োগ করতে হবে। সমন্বিত মৎস্য খামারের আতুর পুকুরে সাধারণত ২১-২৫ দিন রেণু পোনা পালন করা হয়। সাধারণত ৫০-১০০ গ্রাম রেণু প্রতিশতকে মজুদ করা হয়। রেণু মজুদের পর প্রতিদিন জৈব ও অজৈব সার দেওয়া উচিত, প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাদ্য নিয়মিত প্রদান করতে হয়। চালের মিহি, কুড়া, সরিষার খৈল এবং ফিশ মিল মিশিয়ে রেণু পোনার খাদ্য তৈরি করতে হয়।

সমন্বিত মৎস্য খামারের লালন পুকুরের ৩ সপ্তাহ বয়সী ধানী পোনা ছেড়ে মজুদ পুকুরে ছাড়ার উপযোগী আঙ্গুলে পোনা তৈরি হওয়া পর্যন্ত লালন করা হয়। লালন পুকুরে আঙ্গুলে পোনা উৎপাদন করার জন্য ব্যবস্থাপনা কৌশলের ক্ষেত্রে যেসব ধাপসমূহ অনুসরণ করা উচিত তা হলো পুকুর প্রস্তুতি, ধানী পোনা মজুদ, সার প্রয়োগ, খাদ্য সরবরাহ, হররা টানা, নমুনায়ন, পোনার রোগ বালাই প্রতিরোধ এবং পোনা আহরণ। লালন পুকুর প্রস্তুতির নিয়ম আতুর পুকুর প্রস্তুতির অনুরূপ। পুকুর প্রস্তুতির পর প্রতি শতকে ১ ইঞ্চি আকারের ৩২০০-৪০০০ টি পোনা লালন পুকুরে মজুদ করা যেতে পারে। পুকুরে পোনা ছাড়ার পূর্বে অক্সিজেন ব্যাগে, মাটির হাঁড়িতে বা ড্রামে পোনা পরিবহন করা যায়। আতুর পুকুরে রেণু পোনাকে যে খাবার দেওয়া হয় এক্ষেত্রেও একই ধরনের খাবার তৈরি করে পোনাকে খাওয়ানো হয়। দুই-তিন সপ্তাহ পরপর মজুতকৃত পোনার ৫-১০ শতক নমুনায়ন করতে হয়। নমুনায়নের মাধ্যমে প্রয়োগকৃত খাদ্যের পরিবর্তন হার পরিমাপ করা হয়। সমন্বিত মৎস্য খামারের মজুদ পুকুরে ৬-১০ সে.মি. আকারের পোনা অর্থাৎ আঙ্গুলে পোনা ছোড়ে পূর্ণবয়স্ক বা বাজারজাতকরণের উপযোগী মাছ উৎপাদন করা হয়।

সাধারণত ৩০ শতকের বেশি আয়তনের জলাশয় মজুদ পুকুর হিসেবে ভালো হয়। মজুদ পুকুরে পানির গভীরতা ১.৫-২.৫ মিটার হলে ব্যবস্থাপনায় ভালো হয়। মজুদ পুকুর ব্যবস্থাপনা বলতে পুকুর নির্বাচন থেকে শুরু করে মাছ আহরণ পর্যন্ত প্রয়োজনীয় যাবতীয় কার্যক্রমকে বোঝায়। সমন্বিত খামারের মজুদ পুকুরের ব্যবস্থাপনার ধাপগুলো হলো- পুকুর নির্বাচন, পুকুর প্রস্তুতি, পোনা মজুদ, পশুপাখির বিষ্ঠার ব্যবহার, পানির গুণাগুণ নিয়ন্ত্রণ, গ্রাস কার্প মাছের খাদ্য প্রদান, প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা এবং আংশিক মাছ আহরণ। পুকুর প্রস্তুত করার জন্য করণীয় বিষয়গুলো হলো রাক্ষুসে মাছ নির্মূল করা, জলজ আগাছা পরিস্কার করা, চুন প্রয়োগ, সার প্রয়োগ ইত্যাদি কার্যক্রমকে বোঝায়। সমন্বিত মৎস্য খামারের মজুদ পুকুরে পানির গুণাগুণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য মাঝে মাঝে হররা টানা, চুন প্রয়োগ এবং প্রয়োজনে পানি পরিবর্তন করতে হয়। সুষ্ঠু খামার ব্যবস্থাপনায় নির্দিষ্ট সময়ে মাছ আহরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সমন্বিত মৎস্য খামারের ক্ষেত্রে সমন্বিত মৎস্য খামারের বিভিন্ন পুকুরে বিভিন্ন বয়সে মাছের বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ ও সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করে কাঙ্খিত উৎপাদন নিশ্চিত করতে হয়। মাছের বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণের মূল উদ্দেশ্য হলো সুষ্ঠুভাবে মাছ চাষ কার্যক্রম পরিচালনা করা, উৎপাদন উপকরণের ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং প্রতি একক ক্ষেত্রে বেশি উৎপাদন করা। পুকুরে মাছের বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্য পুকুরের পানির পরিবেশ এবং প্রাকৃতিক খাবারের ওপর নির্ভরশীল। নমুনায়নের মাধ্যমে মাছের বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা যায়। মাছের বৃদ্ধি পরীক্ষা করার জন্য যে বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করতে হয় সেগুলো হলো- ক) মাছের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা আছে কি না? খ) দেহের বিভিন্ন অঙ্গের আকার আকৃতির অনুপাত স্বাভাবিক কি না? গ) দেহের তুলনায় মাছের মাথা বড় দেখা যায় কি না? ঘ) বেড় জাল দিয়ে মাছ ধরার সময় মাছ লাফিয়ে জাল থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করছে কি না? ঙ) নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মাছ কাঙ্খিত আকার ও ওজনে পৌঁছাছে কি না? এবং চ) মাছের কোনো অঙ্গের বিকৃতি, ক্ষত বা দেহে কোনো পরজীবী রয়েছে কি না? পুকুরে মাছের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাদ্য থাকলে এবং পানির গুণাগুণ কাঙ্খিত মাত্রায় থাকলে মাছের বৃদ্ধি সঠিকভাবে ঘটে। মাছের বৃদ্ধির হার পর্যবেক্ষণের জন্য মাছের ওজন এবং আকার নিয়মিতভাবে পরীক্ষা করার প্রয়োজন রয়েছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা সমন্বিত মৎস্য খামারের মজুত পুকুর ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন জমা দিবেন।

সারাংশ

সমন্বিত মৎস্য খামারের পুকুর ব্যবস্থাপনা বলতে পুকুরে হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা, গবাদি পশুর মল বা বর্জ্যের পরিমিত বা যথাযথ ব্যবহার, পুকুর প্রস্তুতি, পুকুরের মাছের প্রাকৃতিক খাদ্যের উপস্থিতি পরীক্ষা, পোনা মজুদ, মাছের স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি কার্যক্রমকে বোঝায়। পুকুরের আকার ও গভীরতা মাছ চাষকে প্রভাবিত করে। পুকুরের দৈর্ঘ্য-প্রস্থের অনুপাত ২:১ এবং গভীরতা ১.৫-২.৫ মিটারের মধ্যে থাকে। পুকুরে পর্যাপ্ত সূর্যালোক প্রাপ্তি এবং বাতাস মিশ্রিত করার লক্ষ্যে পুকুর উত্তর দক্ষিণে লম্বা হলে ভালো হয়। সমন্বিত মৎস্য খামারের আতুর পুকুরে সাধারণত ২১-২৫ দিন রেণু পোনা পালন করা হয়। প্রতি শতকে ৫০-১০০ গ্রাম রেণু মজুদ করা হয়। লালন পুকুরে ৩ সপ্তাহ বয়সী ধানী পোনা মজুদ করে আঙ্গুলে পোনা উৎপাদন পর্যন্ত লালন করা হয়। সমন্বিত মৎস্য খামারের মজুদ পুকুরে আঙ্গুলে পোনা ছেড়ে খাবার বা বিক্রির উপযোগী মাছ উৎপাদন পর্যন্ত পালন করা হয়। সমন্বিত খামারের পুকুরে মাছের বৃদ্ধির হার পর্যবেক্ষণের জন্য নিয়মিত বিরতি দিয়ে মাছের ওজন এবং আকার পরীক্ষা করতে হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.২

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। সমন্বিত মৎস্য খামারের আতুর পুকুরের পানির গভীরতা কত হলে ভালো?

(ক) ১.০-১.৫ মিটার (খ) ১.৫-২.০ মিটার
(গ) ২.০-২.৫ মিটার (ঘ) ২.৫-৩.০ মিটার

২। সমন্বিত মৎস্য খামারের লালন পুকুরে কোন্ বয়সের পোনা পালন করা হয়?

(ক) ২ সপ্তাহ (খ) ৩ সপ্তাহ
(গ) ৫ সপ্তাহ (ঘ) ৭ সপ্তাহ

পাঠ-৫.৩ সমন্বিত মাছ চাষে খাদ্য ব্যবস্থাপনা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সমন্বিত মাছ চাষে খাদ্য ব্যবস্থাপনা বলতে কী বোঝায় তা বলতে ও লিখতে পারবেন।
- সমন্বিত মাছে চাষে মাছের খাদ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- সমন্বিত মাছ চাষের ক্ষেত্রে চিংড়ির খাদ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- মৎস্য ভিত্তিক সমন্বিত মাছ চাষে মাছ ও চিংড়ির সম্পূরক খাদ্য প্রস্তুতকরণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।

সমন্বিত মাছ চাষে খাদ্য ব্যবস্থাপনা:

সাধারণভাবে মৎস্য খামার বলতে মাছ চাষের জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্রকে বোঝানো হয় যেখানে শুধুমাত্র বিভিন্ন প্রজাতির মাছের উৎপাদন কার্যক্রমকে জোর দেয়া হয়। অন্য দিকে মৎস্য ভিত্তিক সমন্বিত খামার হলো একটি বহুমুখী উৎপাদন ক্ষেত্র যেখানে মাছের বিভিন্ন প্রজাতির চাষের সাথে সাথে অন্যান্য প্রাণি চিংড়িসহ একত্রে চাষাবাদ করা হয়। এক্ষেত্রে মাছ ও চিংড়ির চাষাবাদ পদ্ধতি, খাদ্য প্রস্তুত, খাদ্য প্রয়োগ পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়গুলো অন্তর্ভূক্ত হয়। মৎস্য ভিত্তিক সমন্বিত মাছ চাষে খাদ্য ব্যবস্থাপনা বলতে সাধারণত: মাছ ও চিংড়ির খাদ্যের সঠিক উপকরণ সঠিক মাত্রায় নির্বাচন, খাদ্য প্রস্তুতকরণ ও খাদ্য প্রয়োগ পদ্ধতি ইত্যাদি কার্যক্রমকে বোঝায়।

মাছ ও চিংড়ির সমন্বিত চাষে পুকুর বা খামারের স্বাভাবিক প্রাকৃতিক খাবারের পাশাপাশি বাইরে থেকে খাবার প্রয়োগ করতে হয়। কারণ শুধুমাত্র প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত খাবার মাছ এবং চিংড়ির পুষ্টি চাহিদা পুরোপুরি মেটাতে পারে না। মাছের পুষ্টি চাহিদা পুরাপুরি মেটানোর জন্য তথা মাছের যথাযথ স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য পানিতে বিদ্যমান প্রাকৃতিক খাবারের পাশাপাশি বাইরে থেকে যে বাড়তি খাবার দেওয়া হয় তাদেরকে সম্পূরক খাদ্য বলা হয়। আর খাদ্যে যখন প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানসমূহ আনুপাতিক হারে ব্যবহার করা হয় তখন তাকে সুষম খাদ্য বলা হয়। বাংলাদেশে প্রাপ্ত মাছের ও চিংড়ির সম্পূরক খাদ্যের উপাদানগুলো হলো- চাউলের কুঁড়া, গমের ভূষি, সরিষার খৈল, আটা, ফিশমিল, চিটাগুড়, গবাদি পশুর রক্ত, কুটি পানা, শামুক, ঝিনুক ইত্যাদি।

সমন্বিত মাছ চাষে মাছের খাদ্য ব্যবস্থাপনা:

সমন্বিত মাছ চাষের ক্ষেত্রে মাছকেও প্রাকৃতিক খাবারের পাশাপাশি সম্পূরক খাদ্য সরবরাহ করতে হয়। প্রকৃতিতে মাছের বিভিন্ন ধরনের খাবার বিদ্যমান। এর মধ্যে যেমন রয়েছে ক্ষুদ্র উদ্ভিদ ও প্রাণি তেমনি রয়েছে দ্রবীভূত পুষ্টি উপাদানসহ অনেক উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ দ্রব্য। মাছের খাদ্য প্রধানত দুই ধরনের যেমন- প্রাকৃতিক ও সম্পূরক খাদ্য। পুকুরের বা খামারের নিজস্ব ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফাইটোপ্লাঙ্কটন উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান সরবরাহের ফলে জলাশয়ে যে খাদ্য উৎপাদন হয় তাই প্রাকৃতিক খাদ্য। আর বেশি উৎপাদনের জন্য প্রাকৃতিক খাদ্যের পাশাপাশি মাছকে বাইরে থেকে যে খাবার সরবরাহ করা হয় তাই সম্পূরক খাদ্য। মাছের সম্পূরক খাদ্য উপাদানগুলোর মধ্যে সরিষার খৈল, চালের কুঁড়া, গমের ভূষি, চিটাগুড় ইত্যাদি প্রধান। মাছের প্রাকৃতিক খাবারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ফাইটোপ্লাঙ্কটন বা উদ্ভিদ কণা হলো- নাভিকুলা, পেডিয়াস্ট্রাম, স্পাইরোগাইরা, এনাবিনা, ইউগ্লিনা ইত্যাদি। আর জুওপ্লাঙ্কটন বা প্রাণি কণার মধ্যে সাইক্লোপস, বসনিয়া, ফিলিনিয়া, ডেফনিয়া ইত্যাদি।

সমন্বিত মাছ চাষে মাছের সম্পূরক খাদ্য প্রস্তুতকরণ:

সমন্বিত মাছ চাষের ক্ষেত্রে খাদ্য প্রস্তুতের সময় প্রথমে পরিমাণ মত খৈল একটি পাত্রে কমপক্ষে ১০-১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে। পরে ভিজা খৈলের সাথে প্রয়োজনীয় পরিমাণ চালের কুঁড়া বা চিটাগুড় মিশিয়ে ছোট ছোট গোলাকার বল তৈরি করতে হবে। তৈরিকৃত খাবারের বলগুলোকে একটি পাত্রে রেখে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পুকুরের কোন একটি নির্দিষ্ট জায়গায় ৩০-৪৫

সে.মি. গভীরতায় ডুবিয়ে রাখতে হবে। যে প্রজাতির মাছের জন্য খাবার তৈরি করতে হবে সে মাছের আকার এবং মুখের আকারের ওপর ভিত্তি করে নির্দিষ্ট যন্ত্রের মাধ্যমে পিলেট বা দানাদার খাবার তৈরি করতে হয়।

সমন্বিত মাছ চাষের ক্ষেত্রে মাছের খাদ্য প্রয়োগ পদ্ধতি:

সমন্বিত মাছে চাষের ক্ষেত্রে খাদ্য প্রয়োগ পদ্ধতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অধিক পরিমাণ মাছ উৎপাদন নিশ্চিত করার জন্য খাদ্য প্রয়োগের বিকল্প নেই। মাছের খাদ্যাভাস ও চাষ পদ্ধতির ওপর খাদ্য প্রয়োগ পদ্ধতি নির্ভরশীল। খাদ্যের প্রয়োগ মাত্রা মাছের নিবিড় বা আধা নিবিড় চাষ পদ্ধতির ওপর নির্ভরশীল। অধিক লাভ নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োগকৃত খাবারের সবটুকুই গ্রহণ করতে হবে। মাছের খাদ্য গ্রহণ মাছের আকারের ওপর নির্ভরশীল হয়। মাছের আকার বাড়ার সাথে সাথে খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ এবং মাত্রাও হ্রাস পেতে থাকে। মাছের খাবার গ্রহণের মাত্রা জলাশয়ের পানির তাপমাত্রা এবং দ্রবীভূত অক্সিজেনের ওপরও নির্ভরশীল হয়। পানির তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে মাছের খাবার গ্রহণের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। মাত্রাতিরিক্ত তাপমাত্রায় মাছকে খাদ্য প্রয়োগের মাত্রা কমিয়ে দিতে হবে। সাধারণ নমুনায়নের মাধ্যমে মাছের গড় ওজন নির্ণয় করে মাছের খাদ্য প্রয়োগের মাত্রা ঠিক করতে হয়। সাধারণভাবে মাছের দেহের ওজনের ৩-৪% হারে খাবার প্রয়োগ করতে হয়। বড় মাছের তুলনায় ছোট মাছের ক্ষেত্রে ঘন ঘন খাবার প্রয়োগ করতে হয়। মাছকে প্রধানত তিনভাবে খাদ্য প্রয়োগ করা হয়। যেমন- ক) হাত দিয়ে খাবার প্রয়োগ খ) চাহিদা অনুযায়ী খাবার প্রয়োগ এবং গ) স্বয়ংক্রিয়ভাবে খাবার প্রয়োগ। কোন মাছ কী পরিমাণ খাবার গ্রহণ করে তার পরিমাণ নির্ধারণ করে সঠিক মাত্রায় মাছকে খাদ্য প্রয়োগ করতে হয়। একই সাথে পুকুরের বিভিন্ন স্থানে খাবার প্রয়োগ করতে হয়। খাবার একবারে না দিয়ে দিনে কয়েকবার প্রয়োগ করলে ভালো। খাদ্য সকাল, দুপুর, বিকাল এই তিন সময়ে দেওয়া যায়। তবে সকাল ও বিকাল বেলা দেওয়া উত্তম। দিনের আলোতে খাদ্য দিতে হবে। সূর্যোদয়ের আগে অথবা সূর্যাস্তের পরে খাবার দেওয়া উচিত নয়। কিছু দিন পর পর পরীক্ষা করে দেখতে হবে মাছ ঠিক মত খাচ্ছে কি না। পরীক্ষা করার পর প্রয়োজন অনুযায়ী প্রয়োগমাত্রা পরিবর্তন করা উত্তম।

সমন্বিত মাছ চাষে চিংড়ির খাদ্য ব্যবস্থাপনা:

সমন্বিত মাছ চাষের ক্ষেত্রে মাছের ন্যায় চিংড়ির ক্ষেত্রেও প্রাকৃতিক খাদ্যের গুরুত্বও অপরিসীম। পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্যের অভাব হলে চিংড়ির দৈহিক বৃদ্ধিও ব্যহত হয় ফলে উৎপাদন ব্যহত হয়। বর্তমানে উন্নত পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষের জন্য উদ্ভিদজাত ও প্রাণিজাত খাদ্যের চাষ বৃদ্ধি পেয়েছে। মাছের ন্যায় চিংড়ির প্রাকৃতিক খাবারও দুই ধরনের। যেমন- উদ্ভিদজাত এবং প্রাণিজাত। চিংড়ি সর্বভূক প্রাণি। প্লাংটন এবং বেনথোস, ক্ষুদ্র পোকামাকড় ও কেঁচো জাতীয় প্রাণি চিংড়ির প্রধান খাদ্য। চিংড়ির উদ্ভিদজাত প্রাকৃতিক খাবারগুলো হলো- নীলচে সবুজ শেওলা, সবুজ শেওলা, সুতার মত শেওলা এবং ডায়াটমস। আর প্রাণিজ প্রাকৃতিক খাদ্যগুলো হলো ছোট ছোট কাঁকড়া, শামুক, ঝিনুক, রুটিফার্স এবং ক্লাডোসেরা। আধা নিবিড় বা নিবিড় পদ্ধতিতে কম জায়গায় অধিক পরিমাণ চিংড়ি চাষের জন্য সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করতে হয়। চালের কুঁড়া, গমের ভূষি সরিষার খৈল, ফিশ মিল, চিটাগুড়, শামুকের মাংস ইত্যাদি চিংড়ির সম্পূরক খাদ্যের উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

সমন্বিত মাছ চাষে চিংড়ির খাবার প্রস্তুতকরণ:

চিংড়ির সম্পূরক খাদ্য প্রস্তুত করার জন্য সম্পূরক খাদ্যের বিভিন্ন উপাদানগুলো পাউডার আকারে সঠিক মাত্রায় মিশিয়ে একত্রিত করা হয়। অত:পর আঠালোজাতীয় খাদ্য উপাদান যা চিংড়ির জন্য ক্ষতিকর নয় তা মিশিয়ে পরিমাণমত পানি যোগ করে মন্ড তৈরি করতে হয়। উক্ত মন্ড দ্বারা পরবর্তিতে যন্ত্রের সাহায্যে পিলেট তৈরি করতে হবে। চিংড়ির সম্পূরক খাদ্য তৈরির উপকরণগুলো হলো- চালের কুড়া, গামের ভূষি, ফিসমিল, সরিষার খৈল, শামুক-ঝিনুকের মাংশল অংশ ইত্যাদি। সম্পূরক খাদ্য তৈরির সময় খাবারের উপাদানগুলো ভালোভাবে গুড়ো হয়েছে কি না তা বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে।

সমন্বিত মাছ চাষে চিংড়ির খাদ্য প্রয়োগ পদ্ধতি:

সমন্বিত মাছ ও চিংড়ি চাষে পুকুরে গলদা চিংড়ির পোনাকে তাদের ওজনের শতকরা ৩-৫ ভাগ হারে খাদ্য প্রয়োগ করতে হয়। দৈনিক দুই বার সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় খাদ্য প্রয়োগ করা উত্তম। খাবারের পিলটকে পুকুরের চারপাশে ছিটিয়ে দিলে ভালো হয়। সন্ধ্যার সময় এবং সূর্যাস্তের সময় খাবার দিলে খাবারের অপচয় কম হয়। সন্ধ্যার সময় সকল চিংড়ি পুকুরের পাড়ের নিকট খাদ্যের সন্ধানে ঘুরাফেরা করে। বাঁশের খাঁচা নাইলন জাল বা পাতলা পুরাতন কাপড় দিয়ে তৈরি করা যায়। এ

পদ্ধতিতে চিংড়ি খাদ্য খেয়েছে কি না তা বোঝা যায়। সরবরাহকৃত খাবার যদি চিংড়ি গ্রহণ না করে থাকে তাহলে জলাশয়ের পানির গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যায়। চিংড়ির খাবার প্রস্তুত করার পর খাবারের গ্রহণযোগ্যতা পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। সাধারণত: খাবার ও চিংড়ির দেহের বৃদ্ধির অনুপাত ২:১ হলেই খাবারটি চিংড়ির জন্য উত্তম এবং গ্রহণযোগ্য। মাঝে মাঝে পুকুর, ঘের বা জলাশয়ে জাল টেনে চিংড়ির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে খাবার প্রয়োগের অনুপাত প্রয়োজন অনুযায়ী কম বা বেশি করতে হয়।

সমন্বিত মাছ ও চিংড়ির খামারের জন্য সম্পূরক খাদ্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে কতগুলো বিষয় বিবেচনায় রাখতে হয়। সেগুলো হলো-

১। খাদ্য উপাদানের বাজারমূল্য
২। খাদ্য উপাদানের সহজলভ্যতা
৩। খাদ্য উপাদানের স্বাস্থ্যসম্মত অবস্থা
৪। খাদ্য উপাদানের পুষ্টিগুণ
৫। খাদ্য উপাদানে পুষ্টিবিরোধী উপকরণের উপস্থিতি
৬। খাদ্য উপাদানে মিশানো পানির বিশুদ্ধতা

সমন্বিত মাছ ও চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় আনতে হবে।

১। **ঋতু বা সময় কাল:** বিভিন্ন ঋতুতে মাছ ও চিংড়ির খাদ্য প্রয়োগমাত্রা বিভিন্ন হয়।
২। **আবহাওয়া:** আবহাওয়ার তারতম্যের কারণে মাছ ও চিংড়ি, খাদ্য প্রয়োগেরও তারতম্য হয়।
৩। **পানির গুণাগুণ:** পুকুর, ঘের বা জলাশয়ের পানির গুণাগুণের ওপর মাছ ও চিংড়ির খাদ্যের প্রয়োগমাত্রার পরিবর্তন হতে পারে।
৪। **খাদ্য গ্রহণের মাত্রা:** মাছ ও চিংড়ির খাদ্য গ্রহণের মাত্রা পর্যবেক্ষণ করে খাদ্য প্রয়োগের মাত্রা পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয়।
৫। **পুষ্টি মান সমৃদ্ধ খাবার:** খাদ্যের পুষ্টিমাণের ওপর ভিত্তি করে মাছ ও চিংড়ির খাদ্য প্রয়োগের পরিমাণের তারতম্য হয়।
৬। **খাবার প্রদানের সময়:** মাছ ও চিংড়িকে খাবার প্রদানের ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হয় যেন নির্ধারিত সময়ে যেন খাবার প্রদান করা হয়।
৭। **খাবারের পরিমাণ:** খাবারের নির্দিষ্ট পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে মাছ ও চিংড়ির খাবারের প্রয়োগমাত্রা পরিবর্তিত হতে পারে।
৮। **খাবার প্রদানের স্থান:** নির্ধারিত স্থানে খাবার প্রয়োগের পর মাঝে মাঝে পরীক্ষা করে দেখতে হয় ঐ স্থানে খাবারের সঠিক ব্যবহার হচ্ছে কি না। পর্যবেক্ষণ শেষে প্রয়োজন অনুযায়ী খাবারের স্থানও পরিবর্তন করতে হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ এলাকায় অবস্থিত কোনো খামার পরিদর্শন করে উক্ত খামারের খাদ্য ব্যবস্থাপনার ওপর একটি প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে জমা দিবেন।

সারাংশ

মাছ ও চিংড়ির সমন্বিত চাষে পুকুর বা খামারের স্বাভাবিক প্রাকৃতিক খাবারের পাশাপাশি বাইরে থেকে সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করতে হয়। শুধুমাত্র প্রাকৃতিক খাবার সমন্বিত মাছ ও চিংড়ি চাষে তাদের পুষ্টি চাহিদা পূরণ করতে পারে না। সমন্বিত চাষে মাছ ও চিংড়ির সম্পূরক খাদ্য উপাদানগুলোর মধ্যে সরিষার খৈল, চালের কুড়া, গমের ভূষি, চিটাগুড় প্রভৃতি প্রধান। উপাদান নির্বাচিত করে সঠিক নিয়মে মাছ ও চিংড়ির সম্পূরক খাদ্য তৈরি করতে হয়। যে মাছের প্রজাতির খাবার তৈরি করতে হবে তার আকার এবং মুখের আকারের ওপর ভিত্তি করে খাবার তৈরি করতে হয়। সমন্বিত মাছ চাষে খাদ্য প্রয়োগ পদ্ধতিও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মাছের খাদ্যাভ্যাস ও চাষ পদ্ধতির ওপর খাদ্য প্রয়োগ পদ্ধতি নির্ভরশীল। সমন্বিত মাছ ও চিংড়ি চাষে পুকুরে মাছ ও চিংড়ির পোনাকে তাদের ওজনের শতকরা ৩-৫ ভাগ হারে খাদ্য প্রয়োগ করতে হয়। সমন্বিত মাছ চাষে সম্পূরক খাদ্য নির্বাচন এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়গুলো ভালোভাবে অনুসরণ করা প্রয়োজন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৩

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। নিচের কোন্‌টি মাছের সম্পূরক খাদ্যের উপাদান?

(ক) রুটিফার্স (খ) ক্লাডোসেরা
(গ) স্পাইরোগাইরা (ঘ) সরিষার খৈল

২। সমন্বিত চাষে চিংড়ির পোনাকে তাদের দেহের ওজনের শতকরা কত ভাগ খাদ্য প্রয়োগ করতে হয়?

(ক) ১-৩ ভাগ (খ) ৩-৫ ভাগ
(গ) ৫-৭ ভাগ (ঘ) ৭-৯ ভাগ

পাঠ-৫.৪ সমন্বিত মাছ ও চিংড়ি চাষ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সমন্বিত মাছ ও চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে কোন্ কোন্ প্রজাতির মাছ ও চিংড়ি অধিকতর লাভজনক তা বলতে ও লিখতে পারবেন।
- প্রজাতি নির্বাচনের বৈশিষ্ট্যসমূহ কী কী তা বলতে ও লিখতে পারবেন।
- মিশ্র চাষ, কার্প ও গলদার মিশ্র চাষ বলতে কী বোঝায় তা বলতে ও লিখতে পারবেন।
- একই পুকুরে মাছ ও গলদা চিংড়ির সমন্বিত চাষ পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।
- মিশ্র চাষে প্রজাতির বৈশিষ্ট্য ও প্রজাতি নির্বাচন কীভাবে করবেন তা বলতে পারবেন।
- বাগদা চিংড়ির ঘের/পুকুর নির্মাণের পূর্বশর্তসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- পোনা মজুদ পূর্ব ও মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনাসমূহ ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করতে পারবেন।

মাছের প্রজাতি নির্বাচন: সমন্বিত চাষের ক্ষেত্রে মাছের প্রজাতি নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সঠিক প্রজাতি নির্বাচনের ওপর মাছের উৎপাদন নির্ভর করে। ইচ্ছে মাফিক প্রজাতি নির্বাচন না করে যে সমস্ত প্রজাতির বাজার চাহিদা বেশি সে সব প্রজাতি চাষ করলে উৎপাদিত মাছের বেশি মূল্য পাওয়া যায়। সমন্বিত চাষের জন্য প্রজাতি নির্বাচনের সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর ওপর নজর রাখতে হবে:

• বাজারে যে সব প্রজাতির চাহিদা বেশি। • যে সব প্রজাতির বর্ধন হার বেশি। • অধিক ঘনত্বে যে সব প্রজাতির বর্ধন হার ও বাঁচার হার বেশি। • যে সব প্রজাতির পোনা সহজে পাওয়া যায়। • যে সব প্রজাতি সহজে রোগাক্রান্ত হয় না। • যে সব প্রজাতি উদ্ভিদ প্লাঙ্কটনভোজী বা সর্বভূক। • যে সব প্রজাতি উচ্চ তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে। মাছের নির্বাচিত প্রজাতিসমূহ ঃ কমন কার্প, সরপুঁটি, নাইলোটিকা, GIFT তেলাপিয়া, রুই, কাতলা, সিলভার কার্প, প্রভৃতি মাছ সমন্বিত চাষের জন্য অধিক উপযোগী। গ্রাস কার্প সমন্বিত মাছ ও ধান চাষের জন্য অনুপযোগী কারণ এরা ধান গাছ খেয়ে ফেলে এবং গাছের গোড়া উপড়ে ফেলে।

চিংড়ির গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতি: বাংলাদেশের স্বাদু ও লোনা পানিতে প্রায় ৬০টি প্রজাতির চিংড়ি পাওয়া যায়। কিন্তু চাষযোগ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয় শুধু গুটি কয়েককে। তাদের মধ্যে যেগুলোর দেশে বিদেশে চাহিদা বেশি এবং দাম বেশি সেগুলোই ব্যাপকভিত্তিতে চাষের আওতাভূক্ত হয়েছে। যেমন- সামুদ্রিক বাগদা চিংড়ি (*Penaeus monodon*) এবং স্বাদু পানির গলদা চিংড়ি (*Macrobrachium rosenbergii*)।

মিশ্র চাষ: কোন জলাশয়ে ভিন্ন খাদ্যাভ্যাস বিশিষ্ট ও ভিন্ন খাদ্যস্তর থেকে খাদ্য গ্রহণকারী একাধিক প্রজাতির মাছের চাষকে মিশ্র চাষ বলা হয়। অন্যভাবে, মাছের মিশ্র চাষ হলো একই পুকুরে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ চাষ করে পুকুরের বিভিন্ন স্তরে বিদ্যমান মৎস্য খাদ্যের পূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে মাছের সার্বিক উৎপাদন সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিশ্চিত করা।

কার্প ও গলদার মিশ্র চাষ: যখন কোন পুকুরে বিভিন্ন নির্বাচিত কার্প ও গলদা চিংড়ি একত্রে চাষ করা হয়, তখন তাকে কার্প ও গলদার মিশ্র চাষ বলে। প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি পূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রপ্তানি আয় বৃদ্ধিসহ দেশের উৎপাদন ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য কার্প ও গলদা চিংড়ির মিশ্র চাষ খুব সহায়ক। মিশ্র চাষের সুবিধাঃ চিংড়ি ও বিভিন্ন প্রজাতির মাছ জলাশয়ের বিভিন্ন স্তরের খাবার খেয়ে থাকে। যেমন- সিলভার কার্প ও কাতলা পানির উপরিস্তরের খাবার খায়, রুই মধ্য ভাগের এবং মৃগেল, কালিবাউশ, কার্পিও এবং চিংড়ি তলদেশের খাবার খেয়ে থাকে। তাই পুকুরে একক প্রজাতি বা একই স্তরের খাবার খায় এমন প্রজাতির মাছ চাষ করলে অনেক খাবার পুকুরে অব্যবহৃত থেকে যায়। পুকুরের সর্বস্তরের খাদ্যের ব্যবহার নিশ্চিত করে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করাই মিশ্র চাষের মূল লক্ষ্য। নিচে মিশ্র চাষের সুবিধাগুলো উল্লেখ করা হলো-

১। পুকুরের সকল স্তরের খাবার যথাযথভাবে ব্যবহৃত হয়। ২। পুকুরের পরিবেশগত ভারসাম্যতা বজায় থাকে। ৩। চিংড়ির বাজার দর বেশি হওয়ায় আনুপাতিক লাভ বেশি। ৪। কম গভীর ও মৌসুমী পুকুরেও লাভজনকভাবে চাষ করা যায়। ৫। চার থেকে ছয় মাসের মধ্যে গলদা চিংড়ি বাজারজাত করা যায়। ৬। চাষীরা সামগ্রিকভাবে অধিক লাভবান হয়ে থাকে। মিশ্র চাষে সুবিধার পাশাপাশি আবার কিছু কিছু অসুবিধাও দেখা দেয়। যেমন- প্রজাতি নির্বাচন সঠিকভাবে না করলে লাভ না হয়ে বরং লোকসানও হতে পারে। ব্যবস্থাপনা তুলনামূলকভাবে কিছুটা জটিল এবং ব্যয় বহুল।

পুকুর বা খামারের স্থান নির্বাচন: গলদা ও কার্পের মিশ্র চাষের জন্য স্থান নির্বাচন একটি গুরুত্বপর্ণ বিষয়। চাষ ব্যবস্থাপনা সঠিক থাকলেও স্থান নির্বাচনে ত্রুটির জন্যও আশাপ্রদ উৎপাদন পাওয়া সম্ভব নাও হতে পারে। কার্প ও গলদার মিশ্র চাষ প্রধানত দু'ধরনের জলাশয়ে করা যায়। যেমন- ক. বাৎসরিক পুকুর এবং খ. ঘের।

ক. বাৎসরিক পুকুর নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে সমস্ত বিষয়ের দিকে নজর রাখতে হবে তাহলো

বাৎসরিক পুকুরের স্থান নির্বাচন:

• এমন পুকুর নির্বাচন করতে হবে যেখানে বছরে অন্ততঃ ৬/৭ মাস ১.৫ - ২ মিটার পানি থাকে। • পুকুরের আয়তন ৪০-৫০ শতকের মধ্যে হলে ব্যবস্থাপনা সহজ হয়। • গাছপালা মুক্ত খোলা জায়গায় পুকুর নির্বাচন করা উচিত। ফলে পুকুরে পর্যাপ্ত সূর্যালোক ও বাতাস প্রবেশ করবে। পুকুর পাড়ে বড় গাছপালা থাকলে তার ডাল কেটে দিতে হবে। • তলদেশ সমান এবং তলায় যেন ২০ সে. মি.এর বেশি পঁচা কাদা না থাকে। • পুকুরের পাড় ভূমি থেকে কমপক্ষে ৩০ সে. মি. উচু থাকা ভালো, ফলে ময়লা আবর্জনা সম্বলিত বৃষ্টির পানি পুকুরে প্রবেশ করতে পারবে না। • পুকুরের মাটি দো-আঁশ এটেল বা বেলে দো-আঁশ হওয়া উত্তম, কারণ এ ধরনের মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা বেশি।

খ. ঘেরের জন্য স্থান নির্বাচন:

• ঘেরের জন্য সুবিধাজনক আয়তন হলো ৫০-৬০ শতাংশ। • ঘেরটি অবশ্যই বন্যামুক্ত এবং সূর্যালোকিত স্থানে হতে হবে। • ঘের দো-আঁশ অথবা এঁটেল মাটির হলে ভালো ফল পাওয়া যাবে।

মিশ্র চাষের প্রজাতির বৈশিষ্ট্য: কার্প ও গলদা চিংড়ির মিশ্র চাষে আশানুরূপ সফলতা পেতে হলে কারিগরী ও প্রযুক্তিগত ব্যবস্থাপণার ওপর অবশ্যই গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। আর তা করার আগেই কার্পজাতীয় মাছ এবং গলদা চিংড়ির গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলো জানতে হবে। বাংলাদেশের স্বাদু পানিতে প্রায় ২৬০টি প্রজাতির মাছ এবং ২৪ প্রজাতির চিংড়ি পাওয়া যায়। তাছাড়া ১২ প্রজাতির বিদেশী মাছ আমাদের নিকট অতিপরিচিত। তবে কার্পজাতীয় মাছের মধ্যে রুই, কাতলা, মৃগেল, সিলভার কার্প, সরপুঁটি, গ্রাস কার্প ইত্যাদি মাছই চাষোপযোগী এবং চিংড়ির মধ্যে কেবলমাত্র গলদা চিংড়িই কার্পজাতীয় মাছের সাথে পুকুর এবং ঘেরে চাষ করা যায়।

কার্পজাতীয় মাছের বৈশিষ্ট্যসমূহ: ১। এসব মাছ জনগণের কাছে সুপরিচিত ও তাদের পছন্দনীয়। ২। এদের চাষাবাদ পদ্ধতি সহজ এবং স্বাদু পানির যে কোনো জলাশয়ে চাষ করা যায়। ৩। এসব মাছ সম্পূরক খাবারে অভ্যস্ত এবং সম্পূরক খাবার দেশের সর্বত্র পাওয়া যায়। ৪। এদের পোনা সর্বত্র ও স্বল্প মূল্যে পাওয়া যায়। ৫। এরা প্রাকৃতিক খাবার খেতে অভ্যস্ত। ৬। এদের কৃত্রিম প্রজনন সহজেই সম্ভব। ৭। এদের বাজার চাহিদা বেশি এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি। ৮। এসব মাছের উৎপাদন ব্যয়ও তুলনামূলকভাবে কম।

গলদা চিংড়ির বৈশিষ্ট্যসমূহ: ১। গলদা চিংড়ি জনগণের নিকট অতি পরিচিত এবং পছন্দনীয়। ২। চাষাবাদ পদ্ধতি সহজ এবং যেকোনো জলাশয়ে চাষ করা যায়। ৩। কার্পজাতীয় মাছের সাথে চাষ করা যায়। ৪। গলদা চিংড়ি সম্পূরক খাবার খেতে অভ্যস্থ এবং এদের সম্পূরক খাবার সব জায়গায় পাওয়া যায়। ৫। এদের পোনা প্রাপ্তির সমস্যা কম। ৬। আন্তর্জাতিক বাজারে এদের যথেষ্ট চাহিদা আছে। ৭। গলদা চিংড়ির রোগবালাই তুলনামূলকভাবে কম হয়। ৮। উৎপাদন ব্যয়ের তুলনায় আয়ের পরিমাণ বেশি। ৯। গলদা চিংড়ি ৪-৬ মাসের মধ্যে বাজারজাতকরণের উপযোগী হয়ে উঠে।

মাছ চাষের ন্যায় বদ্ধ স্বাদু পানিতেও চিংড়ি চাষ সম্ভব। আমাদের দেশে স্বাদু পানিতে সাধারণত: গলদা চিংড়িরই চাষ হয়ে থাকে। স্বাদু পানিতে চিংড়ি চাষ মূলত: বিভিন্ন মাছের সাথে মিশ্র চাষ।

দ্রুত বৃদ্ধি এবং অধিক ফলন নিশ্চিতের জন্যে চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখা উচিত-

- পুকুরের অবাঞ্চিত মাছ/শত্রু নিধন করা
- পুকুরের আগাছা পরিস্কার করা
- উপযুক্ত পরিমাণ চুন প্রয়োগ করা
- চিংড়ি পোনা মজুদের আগে সার প্রয়োগে পুকুরের স্বাভাবিক উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি ও প্রাকৃতিক খাদ্যের উৎপাদন নিশ্চিত করা।
- পরিমিত পরিমাণ চিংড়ি পোনা মজুদ করা
- সম্পূরক খাবারের জোগান দেয়া
- চাষ শেষে পুকুরের পানি কমিয়ে মজুদ চিংড়ি আহরণের ব্যবস্থা করা।

বিভিন্ন মাছের সাথে চিংড়ির মিশ্র চাষ

গলদা চিংড়ি বিভিন্ন মাছের সাথে একত্রে চাষ করা সম্ভব। বিভিন্ন মাছের সাথে গলদা চিংড়ির এই একত্রে চাষকে মিশ্র চাষ বলে। এরূপ মিশ্র চাষকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-
গলদার সাথে মাছের চাষ এবং মাছের সাথে গলদার চাষ।

গলদার সাথে মাছের মিশ্র চাষ

পুকুরে মাছ চাষের ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে পুকুরের সর্বস্তরের খাবারের পূর্ণ ব্যবহার। চিংড়ি সাধারণতঃ পুকুরের তলদেশের খাবার খেয়ে থাকে। একক ভাবে চিংড়ি চাষ করলে পুকুরের উপরিস্তরের খাবার অব্যবহৃত থাকে। তাই এইসব পুকুরে উপরিভাগের খাবার খায় এমন মাছ চাষ করলে সবস্তরের খাবারের সর্বোত্তম ব্যবহার হয়। এক্ষেত্রে গলদার সাথে হেক্টর প্রতি ২৫০ থেকে ৩৫০টি কাতলা বা সিলভার কার্প মাছ মজুদ করলে ভালো ফলন পাওয়া যায়।

মাছের সাথে গলদার মিশ্র চাষ

এ পদ্ধতিতে পুকুরের প্রধান ফসল হচ্ছে মাছ এবং গলদা চিংড়িকে একত্রে চাষ করে বাড়তি ফলন পাওয়া যায়। চিংড়ি যেহেতু তলদেশের খাবার গ্রহন করে তাই এ জাতীয় মিশ্র চাষে নিচের স্তরে খাবার গ্রহনকারী মাছ মজুদ করা যাবে না। সাধারনত: মৃগেল, কালবাউস, মিরর কার্প জাতীয় মাছ এ ধরনের মিশ্র চাষে মজুদ না করাই ভাল। এ পদ্ধতিতে হেক্টর প্রতি ৪০০০ থেকে ৫০০০ গলদা চিংড়ির পোনা মজুদ করলে ভালো ফলন পাওয়া যায়।

লোনা পানিতে চিংড়ি চাষের পদ্ধতি

আমাদের দেশে লোনা পানিতে বিভিন্ন ধরনের চিংড়ি পাওয়া যায়। তার মধ্যে বাগদা চিংড়ি বাণিজ্যিকভাবে চাষ হয়ে থাকে।

বাগদা চিংড়ির চাষ পদ্ধতি

বাগদা চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখা উচিত -

- পুকুর বা ঘের নির্মাণ
- পোনা মজুদ পূর্ব ব্যবস্থাপনা
- পোনা নির্বাচন ও মজুদ করণ
- পোনা মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা

পুকুর বা ঘের নির্মাণ

- সাধারণত: উপকূলীয় এলাকায় যেখানে জোয়ার ভাটার প্রভাব থাকে সেখানেই বাগদা চিংড়ি চাষের উপযোগী এলাকা।
- পুকুর বা ঘেরের আয়তন ১-১০ হেক্টর হলে ভালো।
- পুকুরের তলদেশ সমতল হতে হবে।
- যোগাযোগ ব্যবস্থা, উপকরণ সরবরাহ এবং বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা থাকতে হবে।

- পুকুর বা ঘেরের মাটি এবং পানির অম্লমান যথাক্রমে ৫-৬.৫ এবং ৭-৮.৫ হতে হবে।

পোনা মজুদ পূর্ব ব্যবস্থাপনা

- পুকুরের/ঘেরের তলদেশ এবং পাড়ের আগাছা পরিস্কার করতে হবে।
- পুকুরের তলদেশ ভালোভাবে শুকিয়ে নিতে হবে।
- পানি ঢুকানো ও বের করার গেইটে জাল স্থাপন করতে হবে যাতে রাক্ষুসে মাছ বা ক্ষতিকর প্রাণী প্রবেশ করতে না পারে।
- পুকুরের তলদেশ লাঙ্গল দিয়ে চাষ করে মাটির অম্লমান অনুযায়ী চুন প্রয়োগ করতে হবে (সারণী -১)।
- পুকুরে হেক্টর প্রতি ২০০ কেজি জৈব সার (গোবর) এবং অজৈব সারের মধ্যে ইউরিয়া ৩০-৫০ কেজি এবং ৩০-৫০ কেজি টিএসপি প্রয়োগ করতে হবে।
- এর পর জোয়ারের পানি প্রবেশ করিয়ে পানির উচ্চতা ৪০-৫০ সে.মি. করতে হবে এবং ১ সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হবে। পানির রং হালকা সবুজ হলে বুঝতে হবে পুকুরে পোনা ছাড়ার উপযোগী সময় হয়েছে।

সারণী ১: পুকুরে চুন প্রয়োগের মাত্রা

মাটির অম্লমান	চুন (কেজি/হেক্টর)
৪.০	১১০০
৪.৫	৮৫০
৫.০	৭০০
৫.৫	৫৫০
৬.০	৩৫০
৬.৫	১৭৫
৭.০ ও বেশি	প্রয়োজন নেই

পোনা নির্বাচন ও মজুদকরণ

- সুস্থ্য ও সবল পোনা নির্বাচন করতে হবে। সুস্থ্য পোনার দেহ সাধারণত: বেশ স্বচ্ছ ও সোজা হয় এবং সাঁতার কাটার সময় পুচ্ছ পাখনা বেশ ছড়ানো অবস্থায় থাকে।
- হেক্টর প্রতি সাধারণত: ৩০,০০০ - ৫০,০০০ টি পোনা মজুদ করা যায়।
- পুকুরের পানির তাপমাত্রা ও লবণাক্ততার সাথে খাপ খাইয়ে পোনা ছাড়তে হবে।

পোনা মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা

- পোনা মজুদের ৪-৫ সপ্তাহ পরে পানির গভীরতা বাড়িয়ে ৭০-১০০ সে.মি. করতে হবে।
- প্রতি অমাবশ্যা-পূর্ণিমায় ৪০-৫০% পানি পরিবর্তন করতে হবে।
- পানির স্বচ্ছতা ৪০ সেমি এর বেশি হলে সার প্রয়োগ করতে হবে।
- সাধারণত: অমাবশ্যা বা পূর্ণিমার 'জো' এর সময় বাগদা চিংড়ি আহরণ করা হয়।

পুকুরে মাছ ও গলদা চিংড়ির সমন্বিত চাষ পদ্ধতি: এই পদ্ধতিতে পুকুরে কার্প ও চিংড়ি একত্রে চাষ করে অধিক উৎপাদন পাওয়া যায়। এতে জলাশয়ের পূর্ণ ব্যবহার হয় এবং আর্থিকভাবে লাভবানও হওয়া যায়। নিচে কার্প ও চিংড়ির সমন্বিত চাষ পদ্ধতি পর্যায়েক্রমে বর্ণনা করা হলো–

পুকুর প্রস্তুতি : এক্ষেত্রে সাধারণ মাছ চাষের মতোই পুকুরকে প্রস্তুত করতে প্রয়োজন। চিংড়ি চাষের পুকুরে পানিতে বেশি অক্সিজেন প্রয়োজন হয়। তাই মাঝে মাঝে পুকুরের পানি বদল করতে হয়। পুকুরে গভীরতা ১-১.৫ মিটার হওয়া ভালো।

পাড় ও তলদেশ মেরামত : পাড় ভাঙা থাকলে তা যথাযথভাবে মেরামত করতে হবে। পাড়ে বড় গাছ না রাখাই ভালো। তলদেশ সমান করে নিতে হবে। নতুবা জাল টানতে অসুবিধা হয়। রাক্ষুসে মাছ অপসারণ : পুকুরে বার বার জাল টেনে বা পুকুর শুকিয়ে ফেলতে হবে অথবা রোটেনন বিষ প্রয়োগে মাছ মারা যায়।

চুন প্রয়োগ : মাছ চাষের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান চুন। সাধারণত শতাংশ প্রতি ১ কেজি চুন ছিটাতে বা পানিতে গুলে দিতে হবে। চুন পানিকে শোধন করে এবং পানিতে ক্যালসিয়াম সরবরাহ করে।

সার প্রয়োগ : চুন দেওয়ার ৬-৭ দিন পর জৈব ও অজৈব সার প্রয়োগ করতে হবে। শতাংশ প্রতি ৩-৫ কেজি গোবর বা হাঁস মুরগির বিষ্ঠা পুকুরে দিতে হয়। আবার ১০০-১৫০ গ্রাম ইউরিয়া, ৫০-৭৫ গ্রাম টি.এস.পি এবং ২৫ গ্রাম পটাশ পানিতে গুলে দিতে হবে। সার দেয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে পুকুরের পানির রং সবুজ হলে প্রাকৃতিক খাবার আছে বুঝতে হবে। পুকুরের পানিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদ ও প্রাণির উপস্থিতিকেই প্রাকৃতিক খাদ্য বলে। এবার পুকুরে মাছ অবমুক্ত করার জন্য তৈরি হয়েছে।

পোনা মজুদ : হেক্টর প্রতি ৭,০০০-১০,০০০ টি গলদা, সিলভার কার্প ও কাতলা ১০০০ টি এবং ৫০০০ টি রুই, ৩০ টি গ্রাস কার্প, ২০ টি মৃগেল ও কমন কার্প পোনা মজুদ করতে হবে। তবে মৃগেল ও কমন কার্প মাছ না দিলেও চলে। কারণ চিংড়ি তলদেশের বা নিচের স্তরের খাবার খায়।

খাদ্য প্রয়োগ : মাছের দ্রুত বৃদ্ধির জন্য খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে। চিংড়ির খাবারের মধ্যে ঝিনুক চূর্ণ, আর্টেমিয়া, ফিশমিল, লবণ ও ভিটামিন অবশ্যই থাকতে হবে। চিংড়ির দ্রুত বৃদ্ধির জন্য আমিষ জাতীয় খাবার প্রয়োজন।

আশ্রয় ব্যবস্থা : চিংড়ির দেহের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খোলস পরিবর্তন করে। এ সময় চিংড়ি অত্যন্ত দুর্বল ও নাজুক অবস্থায় থাকে। এসময় চিংড়ি আশ্রয় খোঁজে। এজন্য এসময় পুকুরের কিছু পাতাবিহীন ডালা-পালা পুঁতে রাখতে হবে। পুকুরে কিনারে কলা গাছ ফেলে রাখাও যায়।

পরিচর্যা : কার্প ও চিংড়ির সমন্বিত চাষের পুকুরে কিছু পরিচর্যা করা প্রয়োজন। নিচে তার কিছু বিস্তারিত বর্ণনা করা হলো-

- মাছ ও চিংড়ির স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য মাসে দুবার জাল টেনে দেখতে হবে।
- চিংড়ি নিয়মিত খাবার গ্রহণ করছে কিনা তা যথাযথভাবে পর্যাবেক্ষণ করতে হবে।
- চিংড়ি সকাল বা অন্য কোনো সময় পুকুরের কিনারে বা পানির উপরে এসে খাবি খেলে অক্সিজেন অভাব ঘটেছে বলে বুঝতে হবে। এক্ষেত্রে জাল টেনে, বাঁশ পিটিয়ে পুকুরের পানি নাড়াতে হবে।
- **আহরণ :** উপযুক্ত ব্যবস্থাপনায় চাষ করলে ৬-৭ মাসে চিংড়ি বাজারজাতকরণের উপযুক্ত হয়। এ সময় ১০-১৫ টিতে ১ কেজি ওজন হলে চিংড়ি আহরণ করা সুবিধাজনক হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা মাছ ও চিংড়ির সমন্বিত চাষ পদ্ধতি সরেজমিনে পরিদর্শন করে একটি প্রতিবেদন জমা দিবেন।

সারাংশ

মাছ চাষের ন্যায় বদ্ধ পানিতে চিংড়ি চাষ করা যায়। আমাদের দেশে সাধারণত: স্বাদু পানিতে গলদা এবং লোনা পানিতে বাগদা চিংড়ির চাষ করা হয়। গলদা চিংড়িকে এককভাবে চাষ করলে পুকুরের উপরিস্তরের খাবার অব্যবহৃত থাকে। তাই পুকুরের উপরিস্তরের খাবার খায় এমন মাছ যেমন- কাতলা, সিলভার কার্প বা থাই স্বরপুঁটি মজুদ করলে সর্বস্তরের খাবারের সর্বোত্তম ব্যবহার হয়। এক্ষেত্রে ২০-৬০ মি.মি. দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট্য চিংড়ির পোনা হেক্টর প্রতি ২৫,০০০-৩০,০০০ পরিমাণ মজুদ করা যায়। বাগদার ক্ষেত্রে পুকুর বা ঘের যথাযথভাবে প্রস্তুত করে জোয়ারের লোনা পানি প্রবেশ করাতে হয়। সার প্রয়োগের পর পুকুরের পানির রং হালকা সবুজ হলে পোনা ছাড়তে হবে। সাধারণত: হেক্টর প্রতি ৩০,০০০ - ৫০,০০০ টি বাগদা পোনা মজুদ করা যায়। পোনা মজুদের পর প্রতি অমাবশ্যা-পূর্ণিমায় ৪০-৫০% পানি পরিবর্তন করতে হয়। চিংড়ির দেহের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খোলস পাল্টায়। তাই আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। দ্রুত বৃদ্ধির জন্য চিংড়ির আমিষ জাতীয় খাবার প্রয়োজন। তাই ঝিনুক চূর্ণ, আর্টিমিয়া, ফিশমিল, লবণ, ভিটামিন প্রভৃতি চিংড়ির খাবারের সঙ্গে পরিমিত

পরিমাণে থাকতে হবে। চিংড়ির পুকুরে বেশি অক্সিজেনের প্রয়োজন, তাই মাঝে মাঝে পানি বদল করতে হয়। সাধারণত: অমাবশ্যা বা পূর্ণিমার "জো" এর সময় বাগদা চিংড়ি আহরণ করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৪

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। চিংড়ি পুকুরের কোন্ খাবার খায়?

(ক) মধ্য স্তরের (খ) উপরের স্তরের

(গ) তলদেশের (ঘ) ভাসমান উদ্ভিদ

২। চিংড়ির দ্রুত বৃদ্ধির জন্য কোন্ খাবার প্রয়োজন?

(ক) আমিষ জাতীয় (খ) উদ্ভিদ জাতীয়

(গ) চর্বি জাতীয় (ঘ) শ্বেতসার জাতীয়

পাঠ-৫.৫ মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মাছ পঁচার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশে প্রচলিত পদ্ধতিতে বরফের সাহায্যে মাছ সংরক্ষণ সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বরফের সাহায্যে মাছ সংরক্ষণের সুবিধাসমূহ বলতে পারবেন।
- রৌদ্রে শুকিয়ে মাছ কীভাবে সংরক্ষণ করা যায় তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- শুকিয়ে মাছ সংরক্ষণের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ বলতে পারবেন।
- রৌদ্রে শুকিয়ে মাছ সংরক্ষণের অসুবিধাগুলো কীভাবে দূর করা যায় তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- টিনজাতকরণের মাধ্যমে মাছ সংরক্ষণের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- লবণজাতকরণের মাধ্যমে কীভাবে মাছ সংরক্ষণ করা যায় তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ধুমায়িতকরণের মাধ্যমে মাছ সংরক্ষণ সম্পর্কে আলোকপাত করতে পারবেন।
- হিমায়নের মাধ্যমে কীভাবে মাছ সংরক্ষণ করা যায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মাছ পচনশীল দ্রব্যের মধ্যে অন্যতম। মাছের পুষ্টিমান বজায় রাখার জন্যে এবং পঁচন রোধ করার লক্ষ্যে মাছ আহরণের পর থেকেই সংরক্ষণ করার প্রয়োজন হয়। মাছ ধরার পর একটি নির্দিষ্ট সময় পরে মাছ মরে যাওয়ার পর পঁচতে শুরু করে। মাছ মরে যাওয়ার পর থেকেই পঁচনক্রিয়া শুরু হয় বিধায় ক্রেতাদের নিকট পৌঁছানোর পূর্ব পর্যন্ত এদের সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। এ সময়ের মধ্যে প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সংরক্ষণের কোনো ত্রুটি বা অবহেলা হলে মাছ পঁচতে শুরু করে। মাছ একবার পঁচে গেলে কোনোভাবেই আর তা পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায় না। সাধারণত অণুজীবের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, বিভিন্ন এনজাইমের ক্রিয়া ও বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে মাছের পঁচন হয়।

মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ বলতে সাধারণত: আধুনিক পদ্ধতিতে মাছকে দীর্ঘ সময় গুণগত মান অক্ষুন্ন রেখে সংরক্ষণ প্রক্রিয়াকে বোঝায়। মাছ আহরণের পর যথাসময়ের মধ্যে মাছ প্রক্রিয়াজাত না করলে বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণের ফলে মাছের গুণগত মান নষ্ট হয়ে যায়।

মাছ সংরক্ষণ বলতে এমন একটি পদ্ধতিকে বোঝায় যে পদ্ধতিতে মাছের গুণগত মান ঠিকা রাখা যায়। মাছ সংরক্ষণের জন্যে কতগুলো মূলনীতি অনুসরণ করা হয়। সেগুলো হলো- অণুজীব থেকে মাছকে দূরে রাখা, অণুজীবের বৃদ্ধি ও কার্যকলাপকে বিঘ্নিত করা, মাছ থেকে পানি অপসারণ করা এবং অণুজীবকে ধ্বংস করা।

মাছ পঁচনের কারণ : বিভিন্ন কারণে মাছের পচনক্রিয়া শুরু হয়। তবে মাছের পঁচনক্রিয়া প্রধানত তিনটি উৎস হতে শুরু হয়। নিচে মাছ পঁচনের প্রধান তিনটি কারণ আলোচনা করা হলো-

১. **মাছের দেহের অভ্যন্তরের এনজাইমের ক্রিয়া :** মাছের দেহের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ধরনের এনজাইম বিদ্যমান। এসব এনজাইম জীবিত অবস্থায় মাছের উপকারে আসে, পক্ষান্তরে মাছ মরে গেলে এগুলো ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। জীবিত অবস্থায় মাছ তাদের খাদ্য হজম ও দেহ কোষ গঠনের জন্য এসব এনজাইমকে ব্যবহার করে। মাছ মারা যাওয়ার পর এসব এনজাইম তাদের দেহে বিদ্যমান থাকায় তাদের ক্রিয়ার ফলে মৃত মাছের কোষ-কলা ভেঙ্গে যায় ও মাছ পচতে শুরু করে। মাছের দেহভাঙ্গনের এনজাইমের এই ক্রিয়াকে অটোলাইসিস (Autolysis) বলে। অটোলাইসিস ক্রিয়ার কারণেই মাছের স্বাদ নষ্ট হয়, পেশী নরম হয়, চোখ গর্তের মধ্যে চলে যায় এবং দেহ বিবর্ণ হয়।

২. **ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণুজীবের ক্রিয়া-বিক্রিয়া :** মাছের দেহের বিভিন্ন অংশ যথা- আইশ, চামড়া, ফুলকা নাড়ীভুড়ি ইত্যাদিতে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণুজীব বা ব্যাকটেরিয়া থাকে। জীবিত অবস্থায় এসব জীবাণু মাছের কোনো প্রকার ক্ষতি করতে পারে না। কিন্তু মাছ মরার পর আমাদের চারপাশের পরিবেশে বিদ্যমান জীবাণু এবং মাছের পরিচর্যার সময়, মানুষের হাত,

পরিবহণে ব্যবহৃত পাত্র থেকে জীবাণু মাছকে সংক্রমিত করতে পারে। মাছ মরার পর মাছের বিভিন্ন অংশের জীবাণু এবং পরিবেশ ও ব্যবহৃত পাত্রের জীবাণু মাছের দেহে এনজাইম নিঃসরণ করে মাছের মাংসপেশী নরম করে ফলে দ্রুত মাছের পঁচন ক্রিয়া শুরু হয়।

৩. **বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়া :** মাছের দেহ নানা ধরনের রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা গঠিত। তন্মেধ্যে আমিষ, স্নেহ বা চর্বি প্রধান। মাছের দেহে শতকরা ৭০-৮০ ভাগ পানি থাকে। মাছের চর্বিতে প্রচুর পরিমাণ অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিডসমূহ বিদ্যমান। মাছ মরে যাওয়ার পর এসব অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড (O_2) সাথে বিক্রিয়া করে। মাছের দেহের রাসায়নিক পদার্থসমূহে এ ধরনের ক্রিয়া, বিক্রিয়ার ফলে মাছের জীবকোষ ভেঙে যায়। মাছের স্বাভাবিক বর্ণ ও স্বাদ হয় এবং মাছ পঁচতে শুরু করে।

মাছ সংরক্ষণ পদ্ধতি : মাছ বিভিন্ন পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা যায়। সকল পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য হল মাছের গুণগত মান ঠিক রাখা। বিভিন্ন পদ্ধতিতে মাছ সংরক্ষণের কারণে সংরক্ষিত মাছে গন্ধ, বর্ণ, স্বাদ, ও বাহ্যিক গঠনে কিছুটা পরিবর্তন হয়। মাছ সংরক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলোর নাম নিম্নে দেওয়া হলো :

১. বরফজাতকরণ বা আইসিং (Icing)।
২. লবণজাতকরণ বা সল্টিং (Salting)।
৩. শুটকিকরণ বা ড্রাইং (Drying)।
৪. হিমায়িতকরণ বা ফ্রিজিং (Freezing)।
৫. টিনজাতকরণ বা ক্যানিং (Canning)।
৬. ধূমায়িতকরণ বা স্মোকিং (Smoking)।

১. **বরফজাতকরণ (Icing) :** বরফের সাহায্যে মাছ সংরক্ষণকে বরফজাতকরণ বলে। এটি মাছ সংরক্ষণের একটি স্বল্পকালীন পদ্ধতি। বরফ দিয়ে মাছের দেহের তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস ($0^{\circ}c$) বা এর কাছাকাছি এনে অণুজীবের স্বাভাবিক বৃদ্ধিকে ব্যহত করা ও বংশ বিস্তারে বাধাগ্রস্ত করে মাছ সংরক্ষণকে বরফজাতকরণ বলা হয়। বাংলাদেশে মাছ সংরক্ষণের জন্য ব্লক আইস বেশি ব্যবহৃত হয়।

বরফজাতকরণের সুবিধা : বরফের সাহায্যে মাছ সংরক্ষণের অনেক সুবিধা রয়েছে। যথা :

১. যেকোনো মৌসুমে মাছ সংরক্ষণের জন্য এ পদ্ধতি প্রয়োগ করা সম্ভব।
২. মাছ সংরক্ষণের জন্যে এ পদ্ধতি অন্যান্য পদ্ধতির তুলনায় সহজ।
৩. আমাদের দেশে তুলনামূলকভাবে বরফ সহজলভ্য।
৪. যেকোনো আকারের মাছ এ পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা যায়।
৫. বরফ ক্ষতিকর নয় এবং মাছের সংস্পর্শে এসে খুব দ্রুত মাছকে ঠাণ্ডা করে মাছে পচন রোধ করে।
৬. বরফ দ্বারা সংরক্ষিত মাছ সহজেই পরিবহণ করা সম্ভব।

বাংলাদেশে বরফ দিয়ে মাছ সংরক্ষণের প্রচলিত পদ্ধতি : এদেশে বরফ দিয়ে মাছ সংরক্ষণের প্রচলিত পদ্ধতিতে প্রথমে মাছকে সাধারণ পানি দ্বারা ধুয়ে নেয়া হয়। অতঃপর বাঁশের চাটাই বা মাদুরের তৈরি টুকরীতে বরফ ও মাছ স্তরে স্তরে সাজিয়ে রাখা হয়। সাধারণত ৪ ভাগ মাছের সাথে এক ভাগ বরফ দেয়া হয়। সাধারণত পরিবহন দূরত্ব ও সময়ের ওপর ভিত্তি করে বরফের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। বড় আকারের বরফের ব্লককে গুঁড়া করে ব্যবহার করা হয়। নির্দিষ্ট পরিমাণ মাছ ও বরফ পাত্রে রাখার পর মাদুর বা চটের টুকরা দিয়ে ঢেকে সেলাই করা হয়। পরে কাঠের বাক্স করে দূবরর্তী স্থানে পরিবহন করা হয়। বরফ ও মাছের যথাযথ অনুপাত এবং সঠিক পাত্র ব্যবহার করে মাছকে বরফজাত করে ৭-১০ দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।

বরফ দিয়ে মাছ সংরক্ষণের অসুবিধা :

১. বরফ তৈরিতে অধিকাংশ সময়ই অপরিষ্কার পানি ব্যবহার করে বিধায় ব্যাকটেরিয়া ও অণুজীব দ্বারা মাছ সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
২. তাপ কুপরিবাহী পাত্রে ব্যবহার না করলে বরফের কার্যকারিতা দীর্ঘস্থায়ী সম্ভব নয়।
৩. ব্যবহৃত বরফের টুকরা বড় হলে মাছের শরীরে ক্ষতি হতে পারে।

৪. বরফ ও মাছের অনুপাত সঠিক মাত্রায় ব্যবহৃত হয় না বলে মাছের পুষ্টিমান ঠিক থাকে না।
৫. সংরক্ষণের সময় ব্যবহৃত পাত্র ভালোভাবে পরিষ্কার না করার কারণে ব্যাকটেরিয়া বা জীবাণু দ্বারা মাছ সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

বরফ দিয়ে মাছ সংরক্ষণের অসুবিধা দূর করার উপায় : প্রচলিত পদ্ধতিতে বরফ দিয়ে মাছ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বিরাজমান অসুবিধা বা ত্রুটিসমূহ দূরীকরণ এবং মাছের গুণজাতমান বাড়ানোর জন্য নিম্নের বিষয়গুলো বিবেচনা করা উচিত।

১. সংরক্ষণের জন্যে ব্যবহৃত মাছগুলো সবসময় সতেজ বা টাটকা হওয়া উচিত।
২. একই প্রজাতির একই আকারের মাছ একপাত্রে সংরক্ষণ করা উচিত।
৩. বরফ তৈরিতে ব্যবহৃত পানি পরিষ্কার হওয়া বাঞ্ছনীয়।
৪. বড় আকারের মাছ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে মাছের দেহ হতে নাড়ী ভুড়ি সরিয়ে ফেলতে হবে।
৫. বরফ ও মাছের অনুপাত সঠিক রাখা উচিত। বাংলাদেশে শীতকালে বরফ ও মাছের অনুপাত ১ ঃ ২ এবং ১ ঃ ১ হওয়া উচিত।
৬. মাছ সংরক্ষণ কাজে ব্যবহৃত পাত্র ও সরঞ্জামাদি সবসময় জীবাণুমুক্ত রাখতে হবে।
৭. পাত্রে বরফ ও মাছ এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যেন পাত্রের বরফ গলিত পানি, মাছের ময়লা ও রক্ত সহজেই পাত্রের নিচে চুইয়ে যায়।
৮. মাছ সংরক্ষণের সময় ঝুড়ি বা পাত্রে প্রথমেই একস্তর বরফ দিতে হবে। তারপর মাছ এবং সবশেষে পাত্রের উপরের মুখ বন্ধ করার পূর্বে উপরে আরেক স্তর বরফ দেয়া উচিত।

২. **লবণজাতকরণ (Salting) :** লবণজাতকরণ মাছ সংরক্ষণের একটি সহজ ও দীর্ঘ মেয়াদী পদ্ধতি। লবণজাতকরণ হলো এমন একটি মাছ সংরক্ষণ পদ্ধতি যেখানে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় মাছের দেহে সাধারণ লবণ প্রবেশ করানো হয়, ফলে মাছের দেহ থেকে পানি বের হয়ে আসে। এতে মাছের দেহে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে এবং মাছের দেহে লবণের ঘনত্ব বেড়ে যায় যা অণুজীবের জন্ম ও বৃদ্ধিকে ব্যাহত করে, ফলশ্রুতিতে মাছ সংরক্ষিত হয়। শুধুমাত্র চর্বিযুক্ত মাছকে লবণজাতকরণ করা হয়, লবণায়নের ফলে মাছের দেহের গঠনের, বর্ণের ও গন্ধের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন সম্ভব হয়।

লবণায়নের প্রকারভেদ : লবণজাতকরণ পদ্ধতিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

১. **শুষ্ক লবণজাতকরণ (Dry salting) :** এ পদ্ধতিতে মাছকে কেটে ধোয়ার পর দানাদার লবণ মিশিয়ে সংরক্ষণ করা হয়।
২. **আর্দ্র লবণজাতকরণ (Wet salting) :** এ পদ্ধতিতে মাছকে লবণ দ্রবণে ডুবানো হয় ফলে লবণ মাছের দেহে প্রবেশ করেও দেহ হতে পানি বেরিয়ে আসে। দেহ হতে পানি বের হওয়ার কারণে লবণ দ্রবণে ঘনত্ব কমে যায়।
৩. **মিশ্র লবণজাতকরণ (Mixed salting) :** এ পদ্ধতিতে মাছকে প্রথমে শুষ্ক লবণ দিয়ে লবণায়িত করা হয়। পরবর্তীতে লবণ দ্রবণে রেখে দেয়া হয়। এটি আর্দ্র লবণজাতকরণের তুলনায় ভালো ফলদায়ক।

বাংলাদেশে মাছ লবণায়নে বিভিন্ন পদ্ধতিসমূহ : প্রচলিতশুষ্ক দানাদার লবণ ব্যবহার করে বাংলাদেশে মাছকে লবণজাত করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশে মাছের লবণজাতকরণের দুইটি পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। যেমন-

১. শুষ্ক লবণায়ন পদ্ধতি এবং
২. ভিজা লবণায়ন পদ্ধতি।

১. **শুষ্ক লবণায়ন পদ্ধতি:** এ পদ্ধতিতে মাছকে যে পাত্রে রাখা হয় সে পাত্রের নিচ দিকে ছিদ্র থাকে যেন লবণের দ্রবণ তলা দিয়ে বের হতে পারে। সাধারণত বাঁশের তৈরি ঝুড়ি এ পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হয়। এ পদ্ধতিতে মাছের লবণায়নে নিম্নের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হয় :

   ক. **ড্রেসিং :** প্রথমে মাছের আঁইশ, পাখনা, নাড়ী-ভুড়ি দেহ থেকে ফেলে দেয়া হয়। অতঃপর আড়াআড়িভাবে মাছটির বুকের দিক হতে পৃষ্ঠদেশ পর্যন্ত কয়েকটি টুকরায় ভাগ করা হয়। এমনভাবে টুকরা করা হয় যেন টুকরাগুলো পিছনের দিকে সংযুক্ত থাকে।

   খ. **লবণের অনুপ্রবেশ :** শুষ্ক মাছের দেহের ভিতর ও বাইরে ভালভাবে লবণ মেখে দেয়া হয়। চোখ এবং ফুলকার ভিতরেও লবণ ঢুকানো হয়। এ ক্ষেত্রে লবণ ও মাছের অনুপাত ১ ঃ ৪ হয়। অভিশ্রবণ প্রক্রিয়ায় মাছে পেশীর ভিতর লবণের অনুপ্রবেশ ঘটে।

গ. **রাইপেনিং :** লবণায়িত মাছকে ঝুড়িতে রাখা হয়। পূর্বেই ঝুড়ির তলায় লবণের একটি আস্তরণ দেয়া থাকে। এরপর পর্যায়ক্রমে একবার মাছ পরবর্তীতে লবণ এভাবে সমস্ত ঝুড়ি মাছ দ্বারা সাজানো হয়। পরে খড়ের তৈরি মাদুর দিয়ে ঝুড়িকে ঢেকে রাখা হয়। অতঃপর ঝুড়িকে সাধারণ তাপমাত্রায় ঠাণ্ডা ও ছায়াযুক্ত স্থানে রাখা হয়। এ পদ্ধতিতে ৭-১০ দিনে মাছ রাইপেনিং সমাপ্ত হয়।

ঘ. **গুদামজাতকরণ :** রাইপেনিং করার পর মাছগুলোকে টিনের পাত্রে গুদামজাত করা হয় ও প্রয়োজন অনুযায়ী বাজারজাত করা হয়।

২. **ভিজা লবণায়ন পদ্ধতি :** এ পদ্ধতিতে প্রথমে মাছকে ড্রেসিং করা হয়। এক্ষেত্রে ড্রেসিং-এর সময় মাছের মাথা সম্পূর্ণরূপে কেটে আলাদা করা হয়। এ পদ্ধতিতে মাছকে এমনভাবে তীর্যক করে কাটা হয় যেন কাটা অংশের অধিকাংশ জায়গা বাইরে খোলা থাকে। এর ফলে মাছের লবণায়ন দ্রুত সম্পন্ন হয়। তারপর মাছকে শুষ্ক লবণ দিয়ে মাখানো হয়। অতঃপর লবণ মাখানো মাছকে টিনের পাত্রে এক স্থানে সাজানো হয়। এরূপে পর্যায়ক্রমে টিনের কিছু অংশ ফাঁকা রেখে লবণ মাখানো মাছকে টিনের পাত্রে পূর্ণ করা হয়। ফাঁকা অংশ মাছের দেহ হতে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় বের হয়ে আসা পানি দ্বারা পূর্ণ হয়। তুলনামূলকভাবে ভিজা বা আর্দ্র লবণজাতকৃত মাছের গুণগত মান ভালো হয়ে থাকে এবং মাছকে অনেক দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করে রাখা যায়।

ইলিশ মাছ লবণজাতকরণ পদ্ধতি : ইলিশ মাছ অধিক চর্বিযুক্ত বিধায় শুটককিকরণের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা যায় না। অপরপক্ষে বরফায়ন স্বল্পমেয়াদী সংরক্ষণ পদ্ধতি আর হিমায়ন ব্যয়বহুল পদ্ধতি। তাই বাংলাদেশে জেলেরা লবণজাতকরণের মাধ্যমে ইলিশ মাছকে সংরক্ষণ করে থাকে। লবণায়নের পূর্বে মাছকে ড্রেসিং করে আঁইশ, নাড়িভুঁড়ি কেটে ফেলা হয়। ধারালো ছুরি বা দা দিয়ে মাছের পিঠ থেকে পেটের দিকে আড়াআড়িভাবে $^{১}/_{২}$ ইঞ্চি পুরু করে টুকরা করা হয়। কখনো কখনো পেটের দিকে সংযুক্ত রেখে কাটা হয়। অতঃপর মাছে ওজনের ১৫-২৫% সাধারণ লবণ হাত দ্বারা ভালোভাবে ঘষে কাটা টুকরায় মিশানো হয়। পরে লবণ মিশ্রিত টুকরাগুলোকে ঝুড়িতে বা কাঠের পাটাতনের উপর স্তূপাকারে রাখা হয়। ঝুড়ি বা পাটাতনে পূর্বেই লবণের হালকা স্তর দেয়া থাকে। সবশেষে স্তূপীকৃত টুকরাগুলোকে মাদুর বা চট দিয়ে ঢেকে রাখা হয়। এ পদ্ধতিতে ৫-৭ দিনে মাছের রাইপেনিং হয়। ফলে মাছের গঠন, গন্ধ, স্বাদ ও বর্ণের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন হয়।

বাংলাদেশে ইলিশ মাছ লবণজাতকরণের সুবিধা :

১. ইলিশ মাছ চর্বিযুক্ত হওয়ায় শুটকিকরণ সম্ভব নয়। কিন্তু লবণায়নের মাধ্যমে সহজেই এ মাছ সংরক্ষণ করা সম্ভব।
২. এ পদ্ধতি সহজ ও জেলেদের নিকট অতি পরিচিত।
৩. এ পদ্ধতিতে সংরক্ষিত মাছের পুষ্টিমান অপরিবর্তিত থাকে।
৪. বাংলাদেশে লবণ অপেক্ষাকৃত সস্তা ও সহজলভ্য।

বাংলাদেশে ইলিশ মাছ লবণজাতকরণের অসুবিধা :

১. ভালোভাবে ড্রেসিং করা হয় না এবং ড্রেসিং-এর পর মাছ ভালো করে ধোয়া হয় না। তাই গুণগত মান কিছুটা নষ্ট হয়।
২. লবণায়নের সময় কোনো প্রকার স্বাস্থ্যবিধি মানা হয় না।
৩. অনেক সময় অপরিষ্কার লবণ ব্যবহার করার ফলে মাছের গুণগত মান খারাপ হয়।
৪. লবণ ও মাছের কোন আদর্শ অনুপাত নেই।
৫. লবণজাতকরণে বাজারের অবিক্রিত পঁচা কিংবা বাসি মাছ ব্যবহার করা হয় ফলে লবণায়িত মাছে দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয়।
৬. অনেক সময় অতিরিক্ত লবণ ব্যবহৃত হয় ফলে প্রোটিন ডিন্যাচারেশন হয়।
৭. লবণায়নের পর মাছ খোলা অবস্থায় রাখা হলে মাছের চর্বি বাতাসের সংস্পর্শে এসে জারণের ফলে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয় ও উপদানের গুণগত মান খারাপ হয় এবং চাহিদা কমে যায়।

লবণজাতকরণের সুবিধাসমূহ :

১. লবণজাতকরণের মাধ্যমে মাছ সংরক্ষণে খরচ কম হয়।
২. লবণজাতকৃত মাছকে দীর্ঘদিন সংরক্ষিত রাখা যায়।
৩. এ পদ্ধতিতে মাছ সংরক্ষণ সহজ।
৪. আমাদের দেশে লবণ সস্তা ও সহজলভ্য।

৫. লবণজাতকৃত মাছ অন্যান্য সংরক্ষণ পদ্ধতির তুলনায় সহজে পরিবহণ করা যায়।

৩. শুঁকটিকরণ (Drying) : প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে সূর্যালোক ও বাতাসের মাধ্যমে মাছ থেকে পানি বা জলীয় অংশ হ্রাস করানোকে শুঁটকিকরণ বলা হয়। মাছের শরীরে শতকরা প্রায় ৭০-৮০ ভাগ পানি থাকে। মাছ ধরার পর দীর্ঘক্ষণ রেখে দিলে মাছ পচতে শুরু করে। সূর্যালোকে মাছকে শুকানো হয় বলে মাছের পঁচন রোধ হয়। সূর্যালোকে শুকিয়ে মাছ সংরক্ষণ বাংলাদেশে একটি অতি প্রাচীন পদ্ধতি।

শুঁটকিকরণের উদ্দেশ্য : শুঁটকিকরণের প্রধান উদ্দেশ্য হল মাছকে সংরক্ষণ করা। তাছাড়া নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে মাছ শুঁটকিকরণ করা হয়।

১. মাছের পুষ্টিগত মান ঠিক রাখা।
২. মাছ সংরক্ষণের খরচ কমিয়ে সহজে গুদামজাত করা।
৩. উৎপাদনকে বাণিজ্যিকভাবে ও পুষ্টিমানের বিচারে গ্রহণযোগ্য করে তোলা।
৪. স্বল্প পরিশ্রমে এ পদ্ধতিতে মাছ সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়।
৫. স্বল্প পরিশ্রমে এ পদ্ধতিতে মাছ সংরক্ষণ করা সম্ভব।

শুঁটকিকরণ পদ্ধতি : বাংলাদেশে সাধারণত শীত মৌসুমে সূর্যালোকের সাহায্যে শুকিয়ে মাছ সংরক্ষণ করা হয়। এ সময়ে আর্দ্রতা ও বৃষ্টিপাত কম থাকে। এছাড়া সূর্যালোকের স্থায়িত্বের কারণে শুঁটকিকরণের জন্য অত্যন্ত অনুকূল পরিবেশ বিদ্যমান থাকে। বৃহত্তর চট্টগ্রাম, ফরিদপুর, খুলনা, সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলায় অধিক হারে মাছ শুকিয়ে সংরক্ষণ করা হয়। কারণ এসব জেলায় হাওড় বাঁওড়, বিল ও উপকূলীয় এলাকা থেকে প্রচুর পরিমাণে মাছ ধরা পড়ে। ছোট ও বড় উভয় ধরনের মাছকে শুঁটকিকরণের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হয়। এ পদ্ধতিতে ছোট মাছের ক্ষেত্রে বড় মাছের তুলনায় কম সময় ব্যয় হয়। বাংলাদেশের সূর্যালোকে যেসব মাছ শুঁটকিকরণ করা হয়, সেগুলো হল- চান্দা, পুঁটি, মলা, ডেলা ইত্যাদি। আর যেসব বড় মাছ শুঁটকি করা হয় সেগুলো হল- শোল, গজার, বোয়াল, টাকি, লইট্টা, ছুটি, কোরাল, ফলিচান্দা, রূপচান্দা ইত্যাদি।

ছোট মাছ শুঁটকিকরণ পদ্ধতি : চান্দা, মলা, ডেলা, পুঁটি টেংরা ছোট মাছকে সূর্যালোকে শুকানো হয়। এ পদ্ধতিতে সাধারণত মাছের আঁইশ নাড়ী-ভুঁড়ি পাখনা ইত্যাদি ফেলে দেওয়া হয় না। শুকানোর পূর্বে কখনো কখানো মাছকে ধুয়ে পরিষ্কার করা হয়। পরে মাছগুলোকে চাটাইয়ের উপর বিছিয়ে রোদে দেয়া হয়। এ পদ্ধতিতে সাধারণত ৩-৫ দিনের মধ্যে শুঁটকিকরণ সম্পন্ন হয়।

মাছ শুকানোর সময় বিভিন্ন ধরনের অণুজীব, পোকা-মাকড়, পাখি, কীটপতঙ্গ আক্রমণ করতে পারে। তাই পলিথিন সীট/জাল ব্যবহার করে প্রতিরোধ করা যায়। দ্রুত শুকানোর জন্য মাছগুলোকে উল্টিয়ে দেয়া হয়।

বড় মাছ শুঁটকিকরণ পদ্ধতি : যেসব বড় মাছ শুঁটকিকরণ করা হয়, সেগুলো হল- শোল, গজার, বোয়াল, লইট্টা, ছুরি ইত্যাদি। বড় মাছের শুঁটকিকরণ পদ্ধতিকে ধারাবাহিকভাবে নিচে উল্লেখ করা হলো-

ক. টাটকা ও তাজা মাছ শুঁটকিকরণের জন্যে বাছাই করতে হবে, এতে উন্নত মানের শুঁটকি তৈরি সম্ভব হয়।
খ. প্রথমেই মাছের আঁইশ, পাখনা, নাড়ী-ভুঁড়ি ইত্যাদি ফেলে দিয়ে পানিতে ধুয়ে নিতে হবে।
গ. ধোয়ার পর মাছকে মাথা হতে লেজের দিকে মেরুদণ্ড বরাবর এমনভাবে কাটা হয় যেন লেজের দিকে সামান্য অংশ সংযুক্ত থাকে, যা মাছকে রেদে শুকানোর সময় ঝুলিয়ে রাখতে সহায়তা করে। প্রতিটি কাটা ফালিকে ফিলেট বলা হয়।
ঘ. কাটা প্রতিটি ফালিকে ছুরি দিয়ে মাঝ বরাবর ২/৩ বার কাটা হয় যা মাছকে দ্রুত শুকাতে সাহায্য করে।
ঙ. পাখি বা অন্যান্য প্রাণীর আক্রমণ হতে রক্ষা করার লক্ষ্যে মাছগুলোকে শুকাতে ৭-৮ দিন সময় লাগে।
ঝ. শুঁটকি মাছে সাধারণত ১০-২০% জলীয় অংশ থাকে।

উপরিউক্ত উপায়ে শুঁটকি করার পর মাদুর বা কুঁড়েঘরে রাখা হয়। পরবর্তীতে মাটির পাত্র বা মটকায় রেখে দেয়া হয়। মাটির পাত্রের অভ্যন্তরভাগে ভালোভাবে মাছের তেল মাখানোর পর শুঁটকিগুলো পাত্রে রাখা হয়। ফলে কীটপতঙ্গের হাত থেকে রক্ষা পায়।

বাংলাদেশে শুঁটকিকরণের গুরুত্ব : বাংলাদেশে শীত মৌসুমে প্রচুর পরিমাণে মাছ ধরা পড়ে। সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে সব মাছ বাজারজাত করা সম্ভব হয় না। ফলশ্রুতিতে আহরিত এলাকায় কম দামে মাছ বিক্রি করতে হয় অথবা মাছ পঁচে যায়। তাই সূর্যালোকের সাহায্যে মাছ শুঁটকিকরণ বাংলাদেশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নিচে বাংলাদেশের শুঁটকিকরণের গুরুত্ব উল্লেখ করা হলো-

১. এদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে মাছ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু দেশের মৎস্যজীবীদের দারিদ্র্যতার কারণে উন্নত যন্ত্রপাতি ব্যবহারে আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ সংরক্ষণ করতে অক্ষম। তাই প্রাকৃতিকভাবে স্বল্প খরচে মাছ সংরক্ষণ তথা শুঁটকিকরণ বাংলাদেশের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ।
২. এ পদ্ধতি জেলেদের নিকট খুবই গ্রহণযোগ্য এবং অতি পরিচিত।
৩. এটি একটি তুলনামূলকভাবে সহজ পদ্ধতি।
৪. শুঁটকিকরণের পর শুঁটকির তৈরিকৃত খাদ্যের গুণগতমান তাজামাছের সাথে তুলনীয়।
৫. এটি একটি দীর্ঘমেয়াদী সংরক্ষণ পদ্ধতি বিধায় মাছ অনেকদিন সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়। ফলে যখন বাজারে মাছের পরিমাণ কমে যায় তখন শুঁটকি মাছ বাজারে সরবরাহ করে মাছের চাহিদা পূরণ সম্ভব হয়।
৬. বাংলাদেশে শীত মৌসুমে অর্থাৎ মাছ ধরার ঋতুতে আবহাওয়া ও সূর্যালোক শুঁটকিকরণের অনুকূলে থাকে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশে শুঁটকিকরণের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

বাংলাদেশে প্রচলিত পদ্ধতি শুঁটকিকরণের অসুবিধা :

বাংলাদেশে প্রচলিত পদ্ধতিতে মাছ শুকানোর কতকগুলো অসুবিধা রয়েছে। যেমন-

১. শুঁটকিকরণ সম্পূর্ণরূপে আবহাওয়ার ওপর নির্ভরশীল হওয়ার আর্দ্রতা বেশি থাকলে মাছ শুকাতে অধিক সময়ে প্রয়োজন হয়।
২. শুঁটকিকরণ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ স্বাস্থ্যবিধি মেনে না চলায় শুটকি রোগজীবাণু দ্বারা সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
৩. শুঁটকির গঠন কখনো শক্ত হলে রান্না করায় বেশ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়।
৪. উন্মুক্ত স্থানে শুঁটকিকরণ করা হয় বিধায় সতর্কতার অভাবে বিভিন্ন ধরনের পোকার লার্ভা দ্বারা সংক্রমিত হতে পারে।
৫. শুঁটকি অনেক ক্ষেত্রে কালো বর্ণের হয়, ফলে চাহিদা কিছুটা কমে যায়।
৬. অনেক সময় শুঁটকিকে উজ্জ্বল বর্ণের করার জন্য তেল দ্বারা ব্রাশ করা হয়, ফলশ্রুতিতে বিভিন্নভাবে সংক্রমিত হতে পারে।
৭. অনেক সময় পঁচা মাছ দ্বারা শুঁটকিকরণ করা হয় বিধায় গুণগত মান ঠিক থাকে না।
৮. ত্রুটিপূর্ণ ও অবৈজ্ঞানিক উপায়ে শুঁটকি গুদামজাত করার ফলে গুণগত মান নষ্ট হতে পারে।

শুঁটকিকরণের অসুবিধা দূরীকরণের উপায় :

বাংলাদেশে শুঁটকির গুণগত মান অক্ষুণ্ন রাখার জন্যে নিম্নের পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে-

১. শুঁটকিকরণের জন্যে অবশ্যই টাটকা মাছ ব্যবহার করা উচিত। অধিক চর্বিযুক্ত মাছ শুঁটকিকরণে ব্যবহার করা উচিত নয়।
২. শুঁটকিকরণের জন্যে সর্বদা স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা উচিত। নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের স্বাস্থ্যবিধি মানা উচিত। ব্যবহৃত সকল যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ব্যবহারের আগে ও পরে ভালোভাবে পরিষ্কার করে রাখা উচিত। একাজে ক্লোরিন পানি ব্যবহার করা যেতে পারে।
৩. মাছের নাড়ি-ভুড়ি, পাখনা, আঁইশ অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ছড়াতে হবে যেন মাংসের কোন অংশে ক্ষতি না হয়।
৪. ড্রেসিং করার পর মাছকে উত্তমরূপে ধৌত করা উচিত যেন প্রাথমিক সংক্রমণ না হয়। মাছকে লঘু লবণ পানি (২ - ৫%) অল্প সময়ের জন্য (সর্বোচ্চ ৫ মিনিট) ডুবিয়ে রাখা যেতে পারে।
৫. শুঁটকিকরণের সময় মাছকে মাটিতে বা বালতিতে রাখা উচিত নয়। মাচায় বা চাটাই-এর উপর শুকানো উচিত। ফলে শুকানোর প্রক্রিয়াও দ্রুত হয়। আর পোকা-মাকড়ের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যে শুকানোর সময় জাল টাঙিয়ে রাখা উচিত।

৬. খোলা জায়গায় শুঁটকি মজুদ না করে বায়ু নিরোধক পাত্রে মজুদ করা উচিত। ক্ষেত্রবিশেষে পলিথিন ব্যাগ ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে অধিক পরিমাণ শুঁটকি মজুদের জন্যে টিনের পাত্র ব্যবহার করা উচিত। এক্ষেত্রে BHT, BHA, Vit-C, এক্সটোকোফেরল ইত্যাদি এন্টি অক্সিডেন্ট ব্যবহার করে পাত্রের অভ্যন্তরে জীবাণু রোধ করা উচিত।

৪. **হিমায়িতকরণ (Freezing) :** হিমায়িতকরণ মাছ সংরক্ষণের একটি দীর্ঘমেয়াদী পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করলে এক বছর পর্যন্ত গুণগত মান অক্ষণ্ন থাকে। যে পদ্ধতিতে মাছের দেহে তাপ অপসারণের মাধ্যমে দেহস্থিত পানিকে সম্পূর্ণরূপে বরফে পরিণত করা হয় তাকে হিমায়িতকরণ বলা হয়। বাংলাদেশে চিংড়ি ও অন্যান্য মৎস্য সামগ্রী এ পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করে বিদেশে রপ্তানি করা হয়ে থাকে। হিমায়ন দুই ধরনের হতে পারে। যথা : দ্রুত ও ধীর হিমায়ন। ধীর হিমায়ন সবচেয়ে ভালো হিমায়িতকরণ পদ্ধতি।

হিমায়িতকরণ পদ্ধতি : বরফজাতকৃত বড় আকারের মাছ নাড়ি-ভুঁড়ি, মাথা ও পাখনা ফেলে দিয়ে ঠাণ্ডা পানিতে ভালোভাবে ধুয়ে নিতে হয়। চিংড়ির ক্ষেত্রে মাথা ফেলে দিয়ে সাইজ অনুসারে আলাদা করা হয়। পরবর্তীতে ২০ হতে ৮০ ভাগ ক্লোরিন পানিতে মাছগুলো ডুবিয়ে রাখা হয়। মাছ ও চিংড়ি প্রয়োজন অনুযায়ী ধারালো ছুরি দিয়ে টুকরা করা হয়। টুকরাগুলো ১০-১২ ভাগ সোডিয়াম ট্রাইফসফেট দ্রবণে ১০ মিনিট ডুবিয়ে রাখা হয়। পরবর্তীতে হিমায়িত করা হয়।

৫. **টিনজাতকরণ (Canning) :** মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণের মধ্যে টিনজাতকরণ একটি দীর্ঘমেয়াদী মাছ সংরক্ষণ পদ্ধতি। টিনজাতকরণ হলো এমন একটি প্রক্রিয়াজাতকরণ যেখানে মাছকে সম্পূর্ণরূপে বায়ুশূন্য পাত্রে আবদ্ধ করে অতিউচ্চ তাপমাত্রা প্রয়োগের মাধ্যমে বাণিজ্যিকভাবে জীবাণুমুক্ত করা হয়। বাণিজ্যিকভাবে জীবাণুমুক্ত বলতে বোঝায় যতটুকু জীবাণুমুক্ত করার ফলে সকল ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া মারা যায় বা ধ্বংস হয়। এ পদ্ধতিতে ৩ বছর পর্যন্ত মৎস্য সংরক্ষণ করা যায়।

টিনজাতকরণ পদ্ধতি : এটি বেশ কতকগুলো ধাপে সম্পন্ন হয়। টিনজাতকরণ পদ্ধতিটির বিভিন্ন ধাপসমূহ ধারাবাহিকভাবে নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

১. **কাঁচামাল নির্বাচন :** মাংসল ও চর্বিযুক্ত টাটকা মাছ টিনজাতকরণের জন্য উপযোগী।

২. **টিন বা কৌটা ভর্তিকরণ :** কৌটা হিসেবে টিনের পাত্র বেশি ব্যবহৃত হয়, তবে ক্ষেত্রবিশেষে অ্যালুমিনিয়াম বা কাঁচের পাত্রও ব্যবহৃত হয়। কৌটাকে হাত বা মেশিনের সাহায্যে পূর্ণ করা হয়। সাধারণত কৌটার উপরিভাগ সামান্য পরিমাণ জায়গা ফাঁকা রাখা হয় এবং নিষ্ক্রিয় গ্যাস দ্বারা এ ফাঁকা স্থান পূরণ করা হয়।

৩. **বিভিন্ন উপদান সংযোজন :** খাদ্যের বর্ণ, গন্ধ ও স্বাদ বৃদ্ধির জন্যে গ্লুটামেট, তেল, টমেটো সস বিভিন্ন ধরনের মসলা ইত্যাদি উপাদান সংযোজন করা হয়।

৪. **বায়ুশূন্যকরণ ও কৌটাবদ্ধকরণ :** কৌটার স্ফীতি, জারণ ও টিনের ক্ষয়রোধ করার লক্ষ্যে কৌটাকে বায়শূন্য করা হয় এবং পরে কৌটা বন্ধ করা হয়।

৫. **ধৌতকরণ :** বদ্ধকৃত কৌটার গায়ে লেগে থাকা ময়লা পরিষ্কার করার জন্য কৌটা ধৌতকরণ করা হয়।

৬. **প্রক্রিয়াকরণ ও উত্তপ্তকরণ :** উচ্চতাপে কৌটাস্থিত খাদ্যকে জীবাণুমুক্ত করা হয়। এক্ষেত্রে ১৫ পাউন্ড/ইঞ্চি চাপে ১২১° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় কৌটাকে উত্তপ্ত করা হয়। সাধারণ ৩০ মিনিট তাপ দিতে হয়।

৭. **ঠাণ্ডাকরণ :** তাপ প্রয়োগের ফলে সৃষ্ট কিছু দুর্গন্ধ দূর করার জন্যে ঠাণ্ডা বায়ু বা ঠাণ্ডা পানি দ্বারা ঠাণ্ডাকরণ করা হয়।

৮. **লেবেলিং :** ঠাণ্ডাকরণ করার পর কৌটার দ্রব্যের নাম, কোম্পানির নাম, পুষ্টিমান, মেয়াদ উত্তীর্ণ সময় ইত্যাদি উল্লেখ করে কৌটার গায়ে লেবেলিং করা হয়।

৯. **গুদামজাতকরণ :** কৌটাজাতকরণের পরপরই উৎপাদিত দ্রব্য বাজারজাত না করে বেশ কিছুদিন গুদামজাত করা হয়। কাঙ্ক্ষিত স্বাদ ও গন্ধ পাওয়ার জন্যই গুদামজাত করা হয়।

১০. **ধূমায়িতকরণ (Smoking) :** এটি একটি প্রক্রিয়াজাতকরণের মধ্যে স্বল্পমেয়াদী মাছ সংরক্ষণ পদ্ধতি। ধূমায়িতকরণ হলো মাছ সংরক্ষণের এমন একটি পদ্ধতি যেখানে কাঠ পোড়ানোর ফলে উৎপন্ন ধোয়ার তাপমাত্রা এবং ধুয়াকণার যৌথক্রিয়ায় মাছের দেহ থেকে পানি অপসারিত হয়। মাছের কাঙ্ক্ষিত স্বাদ, বর্ণ ও গন্ধের জন্য বর্তমানে এ পদ্ধতি ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে এ পদ্ধতি দীর্ঘস্থায়ী না হওয়ায় সংরক্ষণ কাজে এর ব্যবহার সীমিত হয়ে আছে।

ধূমায়িতকরণ পদ্ধতি : সাধারণত পরিপক্ব ও চর্বিযুক্ত মাছ ধূমায়িতকরণের জন্যে কাঁচামাল হিসেবে বেশি উপযোগী। ধূমায়িতকরণ প্রক্রিয়ায় ধূমায়নের জন্যে বড় মাছকে কেটে ফিলেট করতে হয় কিন্তু ছোট মাছকে কাটতে হয় না। ব্যাকটেরিয়া ও মোল্ড-এর বৃদ্ধি রোধ করার জন্য মাছকে ৬০-৭০% লবণে ১০ মিনিট ডুবিয়ে রাখা হয়। এতে পেশীতে ২-৩% লবণ প্রবেশ করে। ধূমায়নের জন্যে কাঠের গুড়াঁ ব্যবহৃত হয়। কাঠের গুড়াঁয় ১৫% পানি থাকে বিধায় কাঠের গুড়াঁ মোল্ড দ্বারা সংক্রমিত হতে পারে তাই লবণায়িত মাছকে কাঠের গুড়াঁ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে হয়। ধূমায়িত মাছ সাধারণত কাঠের বাক্সে প্যাকিং করা হয়। এ পদ্ধতিতে ২-৩ সপ্তাহ পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশে প্রচলিত পদ্ধতিতে মাছের লবনায়ণ ও শুটকীকরণের ওপর সরেজমিনে পরিদর্শন প্রতিবেদন শিক্ষকের নিকট জমা দিবেন।

সারাংশ

মাছ একটি পচনশীল দ্রব্য। তাই বরফের সাহায্যে সংরক্ষণ করে মাছের গুণগতমান দীর্ঘ সময় অক্ষুন্ন রাখা যায়। বাংলাদেশে ব্লক বরফ মাছ সংরক্ষণে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। মাছের গুণগতমান ঠিক রাখার জন্য শীতকালে বরফ মাছের অনুপাত ১ঃ২ এবং গ্রীষ্মকালে ১ঃ১ হওয়া উচিত। শুকিয়ে মাছ সংরক্ষণ একটি বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে বেশি চর্বিযুক্ত মাছ ছাড়া ছোট বড় সব ধরনের মাছই সংরক্ষণ করা হয়। প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম এই দুই উপায়েই মাছ সংরক্ষণ করা যায়। এই পদ্ধতিতে তৈরি শুটকীর রং, গন্ধ ও পুষ্টিমান প্রচলিত পদ্ধতির চেয়ে ভালো হয়। প্রাকৃতিক পদ্ধতি আবহাওয়া নির্ভর বলে সব ঋতুতে ব্যবহার সম্ভব হয় না। টিনজাতকরণ প্রক্রিয়াজাতকরণের মধ্যে মাছ সংরক্ষণের একটি দীর্ঘমেয়াদী পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে উচ্চ তাপ প্রয়োগের মাধ্যমে বায়ুশূন্য পাত্রে মাছকে জীবাণুমুক্ত করে সংরক্ষণ করা হয়। টিনজাতকৃত মাছের গুণাগুণ ২-১০ বছর পর্যন্ত ভালো থাকে। লবণজাতকরণ মাছ সংরক্ষণের একটি সহজ পদ্ধতি। এতে মাছের দেহে সাধারণ লবণ প্রবেশ করানোর ফলে দেহ থেকে পানি বের হয়ে আসে এবং লবণের ঘনত্ব বেড়ে যায়, যা অণুজীবের জন্ম ও বৃদ্ধিকে বাঁধাগ্রস্থ করে। ধূমায়িত প্রক্রিয়ায় মাছ সংরক্ষণে ধূম্রকণা ও তাপমাত্রার প্রভাবে মাছ সংরক্ষিত হয় এবংং মাছে বিশেষ গন্ধ, রং ও স্বাদের সৃষ্টি হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৫

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। মাছের পঁচন ক্রিয়া প্রধানত কয়টি উৎস থেকে শুরু হয়?

ক) ১ টি খ) ২ টি

গ) ৩ টি ঘ) ৪ টি

২। শুটকী মাছে তাজা মাছের তুলনায় আমিষের পরিমাণ কিরূপ থাকে?

ক) কম খ) বেশি

গ) সমান ঘ) অত্যাধিক কম

পাঠ-৫.৬ ব্যবহারিক: মাছের খাদ্য তৈরিকরণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি

মাছের খাদ্য তৈরিকরণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি

খাদ্য তৈরিকরণ:

প্রাসঙ্গিক তথ্য

মাছের দ্রুত বৃদ্ধি ও অধিক উৎপাদনের জন্য পুকুরে প্রাকৃতিক খাবারের পাশাপাশি সুষম/ সম্পুরক খাদ্য প্রয়োগ অতীব গুরুত্বপূর্ণ। স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় মাছের খাদ্যেও নির্দিষ্ট মাত্রায় সকল পুষ্টি উপাদান যেমন- আমিষ, শর্করা, স্নেহ, ভিটামিন ও খনিজ লবন থাকা প্রয়োজন। খাদ্য উপাদানগুলোর মধ্যে আমিষ সবচেয়ে বেশি মাত্রায় প্রয়োজন। মাছের খাদ্যে আমিষ চাহিদা উহাদের বয়স, আকার ও প্রজাতির ওপর নির্ভর করে। এজন্য সুষম/ সম্পুরক খাদ্য তৈরির পূর্বে মাছের পুষ্টি চাহিদা জেনে নেওয়া প্রয়োজন। খাদ্যে আমিষের মান ২৫-৩০% হলে ভালো। ধরা যাক, চালের কুড়াঁ, গমের ভূষি, সরিষার খৈল এবং ফিশ মিল ব্যবহার করে মাছের খাদ্য তৈরি করতে হবে এবং ২৫% আমিষ সমৃদ্ধ খাদ্য তৈরিতে উপকরণ সমূহের মিশ্রণের পরিমাপ হবে-

ফিশ মিল - ২০ কেজি
সরিষার খৈল - ২০ কেজি
চালের কুঁড়া - ৩০ কেজি
গমের ভূষি - ৩০ কেজি

প্রয়োজনীয় উপকরণ

চালের কুঁড়া, গমের ভূষি, সরিষার খৈল, ফিশ মিল, ভিটামিন ও খনিজ লবণ, চিটাগুড়, পানি, বালতি, গামলা, বড় মুখওয়ালা পাত্র, চাটাই ইত্যাদি।

কার্যপদ্ধতি

১. প্রথমে পরিমানমত মানসম্পন্ন খাদ্যের উপাদানগুলো বেছে নিন।
২. নির্ধারিত উপাদানগুলো ভালোভাবে গুড়াঁ করে নিন।
৩. চালের কুড়াঁ, গমের ভূষি এবং ফিশ মিল চালুনি দ্বারা ছেঁকে নিন।
৪. প্রয়োজনীয় খৈল কমপক্ষে ১২ ঘন্টা পূর্বে দ্বিগুণ পানিতে ভিজিয়ে রাখুন।
৫. প্রয়োজনীয় পরিমাণ উপকরণ পরিমাপ করে খাদ্যের মানকে আরও সুষম করার জন্য এর সাথে ০.৫-২% ভিটামিন ও খনিজ লবণ যোগ করুন। তৈরি খাদ্যকে পানিতে বেশি সময় ধরে স্থিতিশীল রাখার জন্য বাইন্ডার হিসেবে আটা, ময়দা বা চিটাগুড় ব্যবহার করুন।
৬. সমস্ত উপকরণ একটি পাত্রে নিয়ে ভালোভাবে মিশ্রিত করুন।
৭. মিশ্রনে পরিমাণমত পানি দিয়ে মন্ড তৈরি করুন।
৮. তৈরি মন্ড বা পেষ্ট সরাসরি মাছকে খাদ্য হিসেবে প্রয়োগ করতে পারেন অথবা পিলেট বা বড়ি বানিয়ে পরবর্তী সময়ের জন্য সংরক্ষণ করতে পারেন।
৯. তৈরি পিলেট চাটাইয়ে রেখে ভালোভাবে রৌদ্রে শুকিয়ে রাখুন।
১০. শুকানো খাদ্য বস্তায় বা কোনো পাত্রে বন্ধ করে সংরক্ষণ করুন।
১১. সংরক্ষিত খাবার মাঝে মাঝে রোদে শুকিয়ে নিন।
১২. এবার খাদ্য তৈরির কার্যপদ্ধতি ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিখুন।

সতর্কতা:

১. খাদ্য উপাদানগুলো মানসম্পন্ন হতে হবে।
২. খাদ্য উপাদানগুলো সঠিক অনুপাতে মিশাতে হবে।
৩. স্যাঁতস্যাঁতে ও অপরিস্কার জায়গায় খাদ্য তৈরি করা যাবে না।

৪. সংরক্ষিত খাদ্য রোদে ভালোভাবে শুকাতে হবে। শুকানোর সময় খাদ্যে মাটি লাগালে খাদ্যের মান ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
৫. সংরক্ষিত খাদ্য মাঝে মাঝে রোদে না শুকালে আর্দ্রতার কারণে ছত্রাক বা পোকামাকড়ের সংক্রমনে খাদ্যের মান নষ্ট হবে।
৬. সরিষার খৈলে পুষ্টিবিরোধী উপাদান গ্লুকোসাইনোলেট থাকে যা মাছের বৃদ্ধি ব্যাহত করে। তাই সরিষার খৈল ১২-১৪ ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে ব্যবহার করলে পুষ্টিবিরোধী উপাদানের কার্যকারিতা হ্রাস পায়।

খাদ্য প্রয়োগ পদ্ধতি:

প্রাসঙ্গিক তথ্য:

অধিক উৎপাদন পাওয়ার লক্ষ্যে উন্নত পদ্ধতিতে মাছ চাষের ক্ষেত্রে পুকুরে সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ পদ্ধতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মান সম্পন্ন সম্পুরক খাদ্য প্রয়োগ করে প্রতি একক স্থানে মাছের উৎপাদন ৫-১০ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যায়। পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য পর্যাপ্ত পরিমাণ না থাকলে অধিক পরিমাণে সম্পূরক খাদ্য সরবরাহ করতে হয় এবং প্রাকৃতিক খাদ্য বেশি পরিমাণ থাকলে কম পরিমাণ খাদ্য সরবরাহ করতে হয়। পুকুরের পানির গুণাগুণের সাথে সাথে খাবারের পরিমাণের সম্পর্ক রয়েছে। পুকুরে যেসব খাদ্য সরবরাহ করা হয় তার সবটুকু মাছ সরাসরি খাদ্য হিসেব গ্রহণ করতে পারে না। খাদ্যের কিছু অংশ পানিতে মিশে পানির গুণাগুণকে প্রভাবিত করে। এতে করে অনেক সময় পানির গুণাগুণ খারাপ হতে পারে, ফলে মাছের মৃত্যুও হতে পারে। পুকুরের পানির গুণাগুণ ঠিক রাখার কোনো সুব্যবস্থা না থাকলে প্রতি একরে ১৫ কেজির বেশি খাবার দেয়া ঠিক না। সেক্কি ডিস্কের পাট ১০ সে.মি. এর কম হলে পুকুরে খাবার সরবরাহ বন্ধ রাখতে হবে। সেক্কি ডিস্কের পাট পুনরায় ২০ সে. মি. বা তার অধিক হলে আবার খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। পুকুরে প্রয়োজনীয় পরিমাণে প্রাকৃতিক খাদ্য থাকলে প্রতিদিন সাধারণত: মজুদ মাছের মোট ওজনের ৩-৪ শতাংশ হারে সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করা হয়। মাংশাসী ও রাক্ষুসে মাছের ক্ষেত্রে মজুদ মাছের মোট ওজনের ৪-৫ শতাংশ হারে প্রতিদিন খাদ্য দিতে হয়। পুকুরে সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগের হার মাছের প্রজাতি, বয়স ও ওজনের ওপর নির্ভর করে কম বেশি হয়।

প্রয়োজনীয় উপকরণ:

১. সম্পুরক খাদ্য
২. খাদ্য রাখার জন্য গামলা বা বালতি
৩. খাদ্যদানী বা ট্রে।

কার্যপদ্ধতি

১. নমুনায়নের মাধ্যমে পুকুরে মজুদ মাছের মোট ওজন জেনে নিয়ে খাদ্যের পরিমাণ নির্নয় করুন।
২. কার্পজাতীয় মাছের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় খাদ্য গোলাকার পিন্ড আকারে এবং মাংশাসী ও রাক্ষুসে মাছের ক্ষেত্রে পিলেট আকারে খাদ্য প্রয়োগ করুন।
৩. আকার অনুযায়ী পুকুরের কয়েকটি স্থান নির্দিষ্ট করুন।
৪. খাদ্যদ্রব্য সরাসরি না ছিটিয়ে ডুবন্ত খাবার ট্রে বা পাটাতনে প্রয়োগ করুন।
৫. প্রতিদিন নির্দিষ্ট স্থানে, নির্দিষ্ট সময়ে খাদ্য প্রয়োগ করুন।
৬. প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় খাদ্য ২ ভাগে ভাগ করে সকালে ও বিকালে পুকুরে প্রয়োগ করুন।
৭. অল্প পরিমাণে ও একাধিকবার খাদ্য প্রয়োগের ফলে খাদ্যের অপচয় কম হয়।
৮. সূর্যোদয়ের আগে বা সূর্যাস্তের পর খাদ্য প্রয়োগ করা ঠিক নয়।
৯. খাদ্য প্রদানের স্থান মাঝে মাঝে পরিস্কার করুন।

সতর্কতা

১. খাদ্য অবশ্যই স্বাস্থ্য সম্মত হতে হবে।
২. পুকুরের পানির তাপমাত্রা এবং গুণাগুণের তারতম্যের সাথে খাদ্য প্রয়োগ হারও কমবেশি হবে।
৩. পুকুরে প্লাঙ্কটন উৎপাদন খুব বেশি হলে খাবারের পরিমান কমিয়ে দিতে হবে বা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হবে।
৪. শীতকালে খাবার প্রয়োগের পরিমাণ অর্ধেকের বেশি কমিয়ে আনা যেতে পারে।
৫. ১৫ দিন কিংবা মাসে ১ বার নমুনায়ন করে মাছের দৈহিক বৃদ্ধির সাথে সংগতি রেখে খাদ্যের প্রয়োগমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

হারুন সাহেব ঋণ নিয়ে বাড়ি সংলগ্ন পুকুরে গত বছর মাছ ও চিংড়ির সমন্বিত চাষ করেন। কিন্তু মাছের ফলন কম হওয়ায় তিনি আর্থিক সংকটে পড়েন। পরবর্তীতে সরকারী মৎস্য কর্মকর্তার সাথে পরামর্শ করে তিনি বোঝতে পারেন যে সঠিকভাবে মাছের খাবার প্রয়োগ না করায় তিনি সমন্বিত মাছ চাষে লাভবান হতে পারেননি।

ক) সমন্বিত মাছ চাষে খাদ্য ব্যবস্থাপনা বলতে কী বোঝায়?

খ) সমন্বিত মাছ ও চিংড়ির খামারের জন্য মাছের সম্পূরক খাদ্য প্রস্তুতকরণ পদ্ধতি লিখুন।

গ) সমন্বিত মাছ ও চিংড়ি চাষে সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগে কোন্ কোন্ বিষয়গুলো সতর্কতার সাথে বিবেচনা করা উচিত?

ঘ) মাছ ও চিংড়ির সমন্বিত চাষের ক্ষেত্রে মাছের খাদ্য প্রয়োগ পদ্ধতি আলোচনা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.১ ঃ ১। খ ২। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.২ ঃ ১। ক ২। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৩ ঃ ১। ঘ ২। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৪ ঃ ১। গ ২। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৫ ঃ ১। গ ২। খ